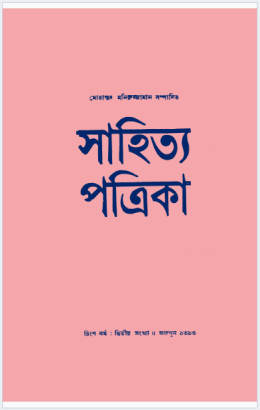

Vol. 30 | No. 2 | 1987

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

বাউল-সাধনার বিবিধ রীতি

Volume	30
Issue	2
Year	1987
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	এস. এম. লুৎফর রহমান
Published online	February 1, 1987
DOI	10.62328/sp.v30i2.4
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v30i2.4
Pages	29-66
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

বাউল-সাধনার বিবিধ রীতি

এস. এম. লুৎফর রহমান

উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য সারা বাঙ্‌লায় বাউলদের মূল সাধনা এক প্রকার ব'লে উল্লেখ ক'রেছেন এবং তাদের মুসলমান বাউল বা ফকীর সম্প্রদায়, (হিন্দু বাউল?) নবদ্বীপ সম্প্রদায় (নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, যশোর, খুলনা, উত্তর বঙ্গ, পূর্ববঙ্গ ও বর্ধমানের কিয়দংশ এর অন্তর্গত) এবং রাঢ়-সম্প্রদায় (পশ্চিম বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম, মেদিনীপুর প্রভৃতি জেলা সমন্বিত) শীর্ষক তিনটি ভাগে বিভক্ত ক'রেছেন।[১] কিন্তু তিনি এসব সম্প্রদায়ের স্ব স্ব বৈশিষ্ট্যের কোন উল্লেখ করেননি। তিনি হিন্দু ও মুসলিম বাউলদেরও কোন আলাদা ক্রিয়া-কলাপ, আচার-বিশ্বাসের পরিচয় দেননি। তাছাড়া, তাঁর নবদ্বীপ-সম্প্রদায়, রাঢ়-সম্প্রদায়, কিংবা হিন্দু-মুসলিম ধর্মভিত্তিক সম্প্রদায় নিরূপণও অসমীচীন।

কারণ হরিশপুর, ছেঁউড়িয়া, নবদ্বীপ, কেন্দুলি, বেতাল বন প্রভৃতি স্থান একদা বাউল অধ্যুষিত হওয়া সত্ত্বেও বাউল-সম্প্রদায় স্থান-কেন্দ্রিক নয়, গুরু-কেন্দ্রিক। তাঁরা গুরুকে কেন্দ্র করেই গোষ্ঠীসৃষ্টি ক'রে থাকেন। এ ব্যাপারে হিন্দু-মুসলিম ধর্মভেদ ও সম্প্রদায় নির্ণায়ক মানদণ্ড প্রযোজ্য নয়। বাউলগণ নিজেরা অসাম্প্রদায়িক। হিন্দু বাউলের মুসলমান শিষ্য এবং মুসলমান বাউলের হিন্দু শিষ্য যথেষ্ট দেখা যায়। কাজেই এ-জাতীয় সম্প্রদায়নির্দেশ অযৌক্তিক।

সর্বশেষে, উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের নির্দেশিত বিভাগ অনুযায়ী বাউল-সাধনার রূপ-বৈচিত্র্যেরও কোন সন্ধান লাভ করা যায় না। ফলে, বাউল-সাধনার বিবিধ রীতি সম্পর্কে ড. ভট্টাচার্যের গ্রন্থ তাই বিশেষ তথ্যসমৃদ্ধ নয়।

উল্লেখযোগ্য যে, বাউলদের কোন গ্রন্থের ভিত্তিতে বাউল-সাধনার পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা সম্ভব নয়। কেননা, এ জাতীয় কোন

রচনার সাক্ষাৎ বর্তমানে বিশেষ দুর্লভ। উনিশ শতকের হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায় থেকে আগত দু'এক জন বাউল কবির যে তত্ত্ব-কাব্য ক্বচিৎ পাওয়া যায়, তা থেকে তাদের সাধন-পদ্ধতির অতি-অল্প তথ্যই লভ্য। বর্তমানে অধিকাংশ বাউল-ই কিছু বৈষ্ণব সহজিয়া দেহতাত্ত্বিক কড়চা গ্রন্থ, চণ্ডীদাস-পদাবলী, নিজেদের সাম্প্রদায়িক সঙ্গীতের ইঙ্গিত ও গুরু নির্দেশ অনুযায়ী সাধন-ভজন করেন। এক্ষেত্রে আরও বিস্ময়কর তথ্য এই যে, একজন গুরুর সকল শিষ্যই অভিন্ন দীক্ষা ও সাধন-পদ্ধতি লাভ করেন না। বাউল সাধনার রূপ-বৈচিত্র্য গুরুভেদে বিভিন্ন তো বটেই, এমন কি শিষ্যভেদেও পৃথক হয়ে থাকে।

তাই বাউল গানের সামগ্রিক সাধারণ বিশ্লেষণ, গবেষকদের আলোচনা, বাউলবিরোধীদের বক্তব্য এবং ব্যক্তিগত অনুসন্ধানের সাহায্যে জ্ঞাত, উনিশ শতকের বাউলদের বিবিধ রকম সাধন-রীতির যতটা সম্ভব পরিচয় নিম্নরূপ বলে নির্দেশ করা যায়।

সাধনার দুটি অঙ্গ

সম্প্রদায় নির্বিশেষে বাউল-সাধনার দু'টি অঙ্গ----সাধন ও ভজন। মৌলবী আবদুল ওয়ালী লিখেছেন--- "Bhajan means bacan, as mystic formulae, or to enchant, or repeat them to pray; Sadhan is to eat or drink, and also to worship, Bhajan increases vhakti or devotion, Sadhan strength. One can never become a devotee unless one gives up rank, family distinction, and fear, or practices Bhajan—Sadhan.[২] উল্লেখযোগ্য যে, সাধন দু'রকম —'বাহ্য-সাধন' ও 'অন্তর-সাধন'। ভজনও দু'রকম---'মানস-ভজন' বা 'মুখের বচন' ও 'দেহের ভজন' বা 'রসের করণ'।

বাহ্য-সাধনের জন্য বাউলগণ নানাবিধ প্রাত্যহিক, সাপ্তাহিক, মাসিক ও বাৎসরিক আনুষ্ঠানিক ক্রিয়ায় অভ্যস্ত, এবং 'অন্তর সাধন' বা 'মনের করণ' রূপে তাঁরা বিশেষ ধরনের দীক্ষা, আসন, প্রাণায়াম, ষট্‌চক্র-ভেদ, নাড়ী-সাধনা তথা আপ্ত জ্ঞানার্জন, নামাজ ও পূজার্চনা প্রভৃতি ক'রে থাকেন। অন্যদিকে 'ভজন' অর্থ 'বচন' ও 'মিলন'। মন্ত্র, সঙ্গীত, জপ, জিকির ইত্যাদি 'মানস-ভজন' এবং বিশেষ পদ্ধতির যৌনমিলন-ই

'দেহের ভজন'। নারী, গাঁজা, ভাঙ, ফুল, ধান, দুর্বা, 'কারণ'বা বিশেষ প্রকার মদ, সেবা, প্রণাম প্রভৃতিও তাঁদের ভজন-উপকরণ।

চারি স্তর

উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের গবেষণা থেকে 'বাউল-সাধনা' সম্পর্কে অল্পাধিক বিন্যস্ত যে তথ্য লাভ করা যায়, তা হ'ল----নর-নারীর মিলিত দেহ-সাধনাই মূলতঃ 'বাউল-সাধনা'। তিনি বৈষ্ণব সহজিয়া কড়চা-গ্রন্থাদির উপর বিশেষভাবে নির্ভর ক'রে উনিশ শতকের বাউলদের সাধন-ক্রিয়ার বিবরণ দিয়েছেন। ড. ভট্টাচার্য কোন স্তর অনুযায়ী বাউল-সাধনাকে চিহ্নিত করেননি। তিনি বাউল-সাধনার পরিচয় স্বরূপ বাউলদের 'তিন দিনের ক্রিয়া,' 'যোগ-মিলন ক্রিয়া' ও তার 'পদ্ধতি' এবং 'চারিচন্দ্রভেদ'-এর উল্লেখ করেছেন।[৩] তাঁর রচনা পাঠ করলে মনে হয়----এ ছাড়া 'বাউল-সাধনা'র আর কোন ক্রিয়া-কলাপ নেই।

কিন্তু অনুসন্ধান করলে জানা যায়, লালনোত্তর বাউল-ফকিরী সাধনা মূলতঃ চারি স্তরে বিভক্ত। যথা----১. স্থূল, ২. প্রবর্ত, ৩. সাধক ও ৪. সিদ্ধ[৪]। এসব স্তরে বাউল-সাধনার নির্দিষ্ট করণ সংক্ষেপে নিম্নরূপ---

১. স্থূল

আলোচ্য স্তর সাধক-জীবনের প্রস্তুতি-পর্ব। দীক্ষা-গ্রহণ, নাম পরিবর্তন, প্রচলিত সংস্কার, রুচি, নীতি, মূল্যবোধ, শাস্ত্র, সমাজ, সংসার, পোষাক-পরিচ্ছদ-ত্যাগ ; সমদর্শন, সংযত জীবন-যাপন, গুরুর উপর একান্ত নির্ভরশীলতা এবং গুরু সেবাই এ স্তরের বিশেষ সাধনা। দৈহিক ক্রিয়া-রূপে--এ সময়ে যোগাভ্যাস, মূত্রধারণ ও তা অল্পে অল্পে বিসর্জনের অনুশীলন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

সম্প্রদায়ভেদে এ-স্তরে 'হরি' নাম উচ্চারণ কিংবা 'নামাজ'-পড়া ও 'জিকির' করার নির্দেশও দেওয়া হয়। দীক্ষিত ব্যক্তিকে এ সময় থেকে আঁচলা, ঝোলা, কাথা, কড়োয়া, ডোর, কৌপীন, বহির্বাস, 'আশা' বা 'চিম্‌টা', খিলকা, তাজ, তহ্‌বন, তস্‌বি, মালা প্রভৃতি ধারণ করতে হয়। একে 'ভেক-গ্রহণ' বলে। আলোচ্য স্তরে নারীসঙ্গ বর্জনীয়।

দীক্ষা গ্রহণ

গুরু ও সম্প্রদায়ভেদে দীক্ষা নানা রকমে সম্পন্ন হয়। হিন্দুসম্প্রদায়ে সাধারণতঃ কর্ণ-মন্ত্রদান, নতুন নামকরণ, গেরুয়া বসন পরিধান, ভক্তিদান প্রভৃতির মাধ্যমে দীক্ষা কার্য সম্পন্ন হয়।

ইস্‌লাম ধর্মের সঙ্গে লগ্ন কোন কোন মুসলিম বাউল সম্প্রদায়ে আষাঢ় মাসের অম্বুবাচিতে আনুষ্ঠানিক মহোৎসবের মাধ্যমে গুরু-মন্ত্র দান, ভেক-দান, 'চক্ষু-দানি' প্রভৃতি কার্য সম্পন্ন করা হয়। গুরু-মন্ত্র গোপনীয়; তা' গুরু-ভেদে ভিন্ন। 'চক্ষু-দানি'ও বিশেষ এক প্রকার গোপন অনুষ্ঠান।

আবার মুসলিম বাউলদের-ই কোন কোন গোষ্ঠীতে দীক্ষাদান কালে শিষ্যকে মৃতের ন্যায় স্নান করিয়ে, ইস্‌লামী রীতি-অনুযায়ী কাফন পরিয়ে, 'জানাজা'-অন্তে 'কবরে' শুইয়ে রেখে (দাফন করে) কিছুক্ষণ পরে উত্তোলন করা হয়। তারপর তাকে গুরু-মন্ত্র দান, ভেক-দান, নতুন নাম-নির্বাচন, 'চক্ষুদানি' প্রভৃতির পর যে কাপড়ে তাকে দাফন করা হয়েছিল সেই কাপড় (পুরুষের বেলায় তিন প্রস্থ এবং নারীর ক্ষেত্রে পাঁচ প্রস্থ)[৫] তার বাকি জীবনের পরিচ্ছদ রূপে নির্দেশ করা হয়। দীক্ষা-গ্রহীতা নারী হ'লে এ সময় তাকে, কোন কোন সম্প্রদায়ে, বন্ধ্যা-করণের উদ্দেশ্যে দ্রব্যবিশেষ খাওয়ানো হয়।

দীক্ষা গ্রহণের পর আর কেউ পূর্ব-নামে পরিচয় দিতে, পূর্ব-পোষাক পরিধান করতে কিংবা চুল, দাড়ি, নখ প্রভৃতি কর্তন করতে পারেন না। কেননা, দীক্ষানুষ্ঠানটি মূলতঃ সংসার-চ্যুত মৃতের করণ রূপে বিবেচ্য। দীক্ষা নেবার পর দীক্ষিত ব্যক্তি মৃত বলে ধর্তব্য। তাই তার সন্তান-জন্মদান, পূর্ব-পরিচয়ে পরিচয় দান, প্রভৃতি নিষিদ্ধ। সমাজ-সংসার-ত্যক্ত এরূপ 'জীয়ন্তে মৃত' ব্যক্তি স্বীয় পরিবার-পরিজনের সঙ্গেও আর সম্পর্ক রাখতে পারেন না।

দম্পতিদের দীক্ষাদানের ক্ষেত্রে এ স্তরে হিন্দু-মুসলিম বাউল-সম্প্রদায়ের কোন কোন গোষ্ঠীকে বিশেষ পদ্ধতির রতি-মিলনসহ 'নেহার' আরোপ প্রভৃতির উপদেশ দান করা হয়।

২ প্রবর্ত-স্তরের সাধনা

স্থূল স্তরে আচরিত সমস্ত সাধনা, এ স্তরেও অব্যাহত থাকে। তবে তা' পূর্বাপেক্ষা আরও দৃঢ়তা এবং নিষ্ঠার সঙ্গে পালিত হয়। এ পর্বে অবিবাহিত বা অবিবাহিতা শিষ্য কিংবা শিষ্যাকে সাধন-সঙ্গীর সাহচর্য গ্রহণে অনুমতি দেওয়া হয়। প্রবর্ত স্তরে বিবাহিত দম্পতিদেরও দেহ-ভজনার বিশেষ পদ্ধতি শিক্ষাদান করা হয়। তাছাড়া যৌগিক আসন, প্রাণায়াম, ষট্‌চক্রভেদ, কিংবা লতিফা জারীর উচ্চতর উপদেশও শিক্ষা দান করা হয়। সাধক-সাধিকা এ পর্যায়ে আপন শরীর ও মনের উপর কথঞ্চিৎ নিয়ন্ত্রণক্ষমতা লাভ করেন। আলোচ্য পর্বে গুরু-সেবা দাস্যভাব প্রাপ্ত হয় এবং প্রাণায়ামের সংখ্যা ও জিকিরের সময় বৃদ্ধি পায়। মুসলিম বাউলগানের কোন কোন সম্প্রদায়ে এস্তরে 'হকিকী' ও 'দায়েমী' নামাজের উপদেশ দেওয়া হয়। এ সময় সাধক-সাধিকার মলমূত্র রোধ ও তা ধারণের কথঞ্চিৎ ক্ষমতা জন্মে।

৩ সাধক স্তরের সাধনা

তারপর তৃতীয় স্তরে সাধক-সাধিকা নির্বিশেষে----সাধন-ভজনের অতি দুর্গম, জটিল ও বিপদসঙ্কুল পথ-পরিক্রমায় অবতীর্ণ হন। সকল সম্প্রদায়ের বাউলদের মধ্যেই আলোচ্য পর্যায়ের সাধনা, সামগ্রিকভাবে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সাধন-ভজনের ক্ষেত্রে এ পর্ব অতি দীর্ঘ, ক্লান্তিকর ও কষ্টদায়ক। পূর্বোক্ত দু'স্তরের অভ্যাসাদিসহ এ সময় থেকে প্রত্যেককেই 'নিত্যক্রিয়া,' 'সাপ্তাহিক ক্রিয়া,' 'মাসিক (তিন দিনের) ক্রিয়া' ও 'বাৎসরিক ক্রিয়াদি' পালন করতে হয়। উক্ত ক্রিয়াসমূহ---'রসের করণ' নামে অভিহিত।

ক নিত্য-ক্রিয়া : চন্দ্রভেদ

উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বাউলদের 'নিত্যক্রিয়া'র কোন উল্লেখ করেন নি। অন্যত্রও এ ক্রিয়ার কোন লিখিত বিবরণ দৃষ্ট হয় না। তবে, আলোচ্য কর্মের অন্তর্গত 'চন্দ্রভেদ' বা 'চারিচন্দ্রের সাধনা' অল্পবিস্তর সর্বত্রই আলোচিত হতে দেখা যায়। ব্যক্তিগত অনুসন্ধান থেকে জানা যায়,

'নিত্যক্রিয়া' রূপে 'ত্রিসন্ধ্যা জলভরণ' ও 'চন্দ্রভেদ' করা আবশ্যক। এ বিষয়ে জনৈক লালন-পন্থী বাউলের সঙ্গে আমার নিম্নোক্ত আলোচনা বিশেষ তথ্যপূর্ণ।

বাউলদের 'চারিচন্দ্রভেদ' সম্পর্কে আমার এক প্রশ্নের জবাবে উক্ত বাউলের বক্তব্য--'চারিচন্দ্র পান সম্পর্কে কথা হল, দেহের মধ্যে সর্বদাই সপ্ত সমুদ্রের স্রোত বইছে। সেই স্রোতের ধারায় ভেসে আসে—মল, মূত্র বীর্য ও রস। তাদের স্বাদ সব সময় এক রকম নয়। এসবের সাত রকম স্বাদ পাওয়া যায়। তিতু, ইক্ষু, মিঠু, কটু, ঠাণ্ডু (ঠাণ্ডা), গরম ও মধু। কথিত চারি পদার্থ নির্গত হবার সময় সর্বক্ষণ স্বাদ নিতে হবে। যে স্রোতধারায় একমাত্র 'মধু' আস্বাদ অনুভূত হবে, একমাত্র সেই ধারার সেই বস্তু গ্রহণ করা বিধেয়। অন্যান্য স্বাদযুক্ত ধারার সমস্ত দ্রব্য বর্জনীয়। কিন্তু 'মধু' স্বাদ অনুভূত হলেও ঐ ধারার বস্তু শূন্য পেটে গ্রহণ করা অনুচিত। তাতে শরীরের ক্ষতি হয়। তাছাড়া, অসুস্থ এবং রোগাক্রান্ত অবস্থায়ও কোন দ্রব্য গ্রহণ করা কর্তব্য নয়।'...

: আর কি করতে হয়?

: এছাড়া ত্রি-সন্ধ্যা 'জল-ভরণ' করতে হয়।

: 'জল ভরণ' কি ভাবে করণীয়?

: জল ভরণ' হ'ল পানিতে কিছু চাউল ভিজিয়ে রেখে সেই পানি মন্ত্র যোগে শোধন করে—সকালে, দুপুরে ও সন্ধ্যায় পান করা। সাধক ও সাধিকা উভয়েরই এই পান-ক্রিয়া আবশ্যক।

: কি মন্ত্র পড়তে হয়?

: তাকে গুরু-মন্ত্র বলে। মন্ত্রটি হ'ল----

গুরু মুখে খাই ব্রহ্মমুখে চাপি
যে বয়সে খাই, সেই বয়সে থাকি।
কার আজ্ঞে? কিশোরীর আজ্ঞে।
দেহ জুড়ে থাকগে।
ভগবতী সহায়।'[৬]

তান্ত্রিক বাউলদের পরিভাষায় একে 'গায়ত্রী-ক্রিয়া' বলে। 'গায়ত্রী-ক্রিয়া'য় তিন প্রকার মন্ত্র ব্যবহৃত হয়। বীজমন্ত্র, অমর মন্ত্র ও অজর

মন্ত্র বা গুরুমন্ত্র। শুক্র ও রজঃ—বীজমন্ত্রে, মূত্র অমর মন্ত্রে এবং বিষ্ঠা অজর-মন্ত্রে শোধন করতে হয়।[৭]

কিন্তু উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বলেছেন—"মুসলমান জাতির বাউল বা ফকিররা কোনো মন্ত্র পাঠ করে না, তবে অনেকে 'আলেকজান' বা 'মুরশিদ জান' বা 'খোদা-নিরঞ্জন' প্রভৃতি উচ্চারণ বা 'জয় গুরু' প্রভৃতি উচ্চারণ করিয়া পান করে।"[৮] এ. এইচ. এম. ইমাম উদ্দীনের রচনাতেও এ বিবরণের পুনরুল্লেখ দৃষ্ট হয়।[৯] কিন্তু তাঁদের উক্তি ঠিক নয়। নানা স্থানের মুসলিম বাউলদের মধ্যে মন্ত্রের ব্যবহার বিদ্যমান। তাঁরাও হিন্দু বাউলগণের মত মন্ত্র সহযোগে 'চন্দ্র'-শোধনান্তে তা' নানাবিধ উপায়ে গ্রহণ করেন। উদাহরণ স্বরূপ যশোর জেলাস্থ মাগুরা মহকুমার দুজন লালনপন্থী হিন্দু ও মুসলিম বাউল ফকীরের খাতায় প্রাপ্ত এরূপ কয়েকটি মন্ত্র নিম্নে উদ্ধৃত হ'ল।

১ মাটি-(বিষ্ঠা) সাধন মন্ত্র

ক. ইলিং পিলিং ক্লিং স্বাহা।

খ. ব্রহ্ম মুখে খাই বস্তু
শিবো মুখে ছাকি
যে ওমরে খাই বস্তু
সেই ওমরে থাকি॥

গ. বিচমোল্লা মালেক আল্লা
আল্‌হামদো লেল্লা।
আল্লা গো
আদমের সওদাগর তুমি
আমি যা বলি তাই শোন
মুহাম্মদ রসুল----
আমার অনুসার সুমার করো
দোহাই মা—বরকত॥

শেষোক্ত মন্ত্রটি খাতায় "মা বরকত সাধন মন্ত্র" শিরোনামে লিখিত ছিল। মন্ত্রটি এক শ'বার জপ করার নির্দেশ থেকে মনে হয় এটি হয়তো বিষ্ঠা-সাধন ভিন্ন অন্য কোন উদ্দেশ্যেও ব্যবহৃত হত।

২. রস-(মূত্র)সাধন মন্ত্র

ক রসে এস রসে বস রসে কর ভর
এই রসেতে গুরু গোঁসাই কণ্ঠে কর ভর।
বসিতে আসন দিব চক্ষের উপর
গুরু সত্য গুরুর বাক্য সত্য॥

খ. আসতি নালে যাতি খালে
রস চন্দ্ররা প্রণতি করে।
ধারা চন্দ্র খিরো বাই—
তোমাকে বিশ্বাস করলে মুর্শীদ
দিনকের খবর দিনে পাই॥

একার্য সকাল-সন্ধ্যায় প্রত্যহ করণীয়।

৩. রতি-(রজঃ) সাধন মন্ত্র

ক. নীরের মধ্যে নিরঞ্জন
সবে রতি ঝরে।
লাল মানুষ বিশ্বাস করিলে
দেহে মালেক বিরাজ করে॥

খ. ওঠ ওঠ নবীজি রক্ত তেরি বরণ
তোমার স্মরণে আমার
না হয় মরণ।
তন কাঁচা কাঁচা হাড়
জুয়ারে হুহুংকার।
যে ওমরে খাই —
সেই ওমরে থাকি
মুখখানি পূর্ণিমার চান্দি
যুগে যুগে রাখি॥

৪. শুক্লচন্দ্র--(শুক্র)সাধন মন্ত্র

ক আগম নদী বেগম পানি
মুর্শীদ দোজখে চলিলা

আমি চন্দ্র ব'লে টলিতে চাও
দোহাই আল্লা-নবী—
ইলিং পিলিং ক্লীং স্বাহা।

খ. পহেলা বিচমোল্লা
দেলেরি স্বপন
এক বিছে (বীজে?) দুই তন
মিলাও আল্লা মুর্শীদ আমায় নিরঞ্জন।"

গ. সাক্ষী থাক আলেক সাঁই
বীজ রইল জবা মুন্দিরের ঠাঁই
কোন্ কোন্ বীজ----
ইলিং পিলিং ক্লীং স্বাহা।

এরূপ আরও অনেক মন্ত্র আছে।

উল্লেখ্য যে চারি চন্দ্রের মধ্যে প্রথমোক্ত দু'টি চন্দ্রের সাধনাই বাউল-দের নিত্য-ক্রিয়ার অন্তর্গত। বাকি দু'টি চন্দ্রের সাধনা প্রতি মাসে 'তিন দিন' করণীয়। তখনও ঐসব মন্ত্র ব্যবহৃত হয়। যে রূপেই 'চন্দ্র'-সাধন করা হোক না কেন--'মন্ত্র' একই। শুধু গুরু-ভেদে ভিন্নতা। আরো উল্লেখ করা আবশ্যক যে, মন্ত্রের ব্যবহার শুধু পুরুষের জন্য নয়, নারীর জন্যও নির্দিষ্ট আছে। স্ত্রীলোকের ব্যবহার্য এরূপ একটি মন্ত্র নিম্নরূপ:

প্রোদা পোষ মা
তুমার নাড়ি চাড়ি
আমারে পোষ।

এটি কি কার্যে কিরূপে ব্যবহার্য----খাতায় তার নির্দেশ নেই। খাতাধি-কারীও বর্তমানে মৃত।

যাহোক, বর্তমান বাউলগণের অত্যল্পই 'নিত্যক্রিয়ায়' 'চন্দ্রভেদ' করেন। তবে 'জল-ভরণ' অনেকে করে থাকেন।

তাছাড়া বাউল ফকীরগণ 'নিত্য-ক্রিয়া' রূপে প্রতি সন্ধ্যায় ও রাতে বিশেষ রীতির 'নামাজ' 'জিকির' 'জপ', 'আসন' ও প্রাণায়াম দ্বারা 'কুণ্ডলিনী জাগরণে' অভ্যস্ত হন।

বাউল ফকিরী নামাজের বৈশিষ্ট্য এই যে, এ নামাজ প্রতি দিন মগ্‌রিবের সময় ইস্‌লামী রীতি অনুযায়ী (ওজু করে) পবিত্র অবস্থায় জায়-নামাজে'র উপর উপবিষ্ট হ'য়ে নিম্নোক্ত মন্ত্র বা দোয়া একচল্লিশ বার আবৃত্তির পর দু'টি দীর্ঘ সিজ্‌দা দিতে হয়। এতেই নামাজ সমাপ্ত হয়। 'দোয়া'টি হ'ল—

ডান হাতে হক
বাও হাতে নূর
আমারে চরণ দাও
মোহাম্মদ রসুল।

অবশেষে মধ্যরাত অতিক্রমের পর অনুরূপ দু'রাকাত নামাজান্তে সকাল পর্যন্ত 'ধ্যান', 'জপ', 'জিকির' প্রভৃতি ক্রিয়ায় রত থাকা আবশ্যক। জিকির নানা রকম। এরূপ কতিপয় জিকিরের নমুনা নিম্নরূপ:

১. হক পয়মানা
বে—হক্কে নূর—
আমার রূপের স্বরূপ
দেখা দাও মোহাম্মদ রসুল।

২. হক মিলায়ে দে গো আল্লা
হক মিলায়ে দে
হকের হাকিম রাসুল উল্লা'
হাজির করে দে॥

৩. এলাহি আহাদি ছামাদি মিন ইন্‌দি আহাদি।
(এ দোয়া-তিন হাজার বার পঠনীয়।)

৪. লায় লাহা ইল্লাল্লাহ্।

৫. আল্লা হু। প্রভৃতি।

বাউল-ফকীরদের মধ্যে সম্প্রদায়ভেদে 'নামাজ', 'জিকির', 'জপ', 'ধ্যান' প্রভৃতির প্রভেদ বিদ্যমান। কোন কোন আধুনিক ফকীর-সম্প্রদায়ে ইসলামী রীতি অনুযায়ী নামাজ ও সূফী পদ্ধতিমূলক জিকির আজকালও করা হয়।

২. সাপ্তাহিক ক্রিয়া : নৈশ-মিলন

বাউল-সাধনার এ স্তরে সাধকগণ সাপ্তাহিক নৈশ-মিলনে সমবেত হন। সপ্তাহের কোন এক বিশেষ রাতে মহল্লাস্থ সকল বাউল সাধক-সাধিকা গুরুর আখড়ায় একত্রিত হয়ে সংগীত নৃত্য, গাজা, ভাঙ্, মদ্য, বাদ্যযন্ত্র প্রভৃতি সহযোগে সাধন-ভজন করেন।

মৌলবী আবদুল ওয়ালী লিখেছেন----The devotees meet on Saturday night at a Place—akhrā,—with musical instruments, bhang, ganja and liquor. Men and women in the midst of narcotics and music commence reciting the mystic furmulae many times. Thus by the commingling of many minds bhajan is accomplished.[১০] এ উক্তি সত্য। আলোচ্য নৈশ-চক্রে বাউল নর-নারীগণ একত্রিত হ'য়ে প্রত্যেক পুরুষের বামে একজন স্ত্রীলোকসহ সকলে চক্রাকারে উপবিষ্ট হয়ে সর্বপ্রথম সবাই মাথা নত করে 'সিজ্‌দা' দেন। একে 'হকিকী' নামাজ বলে। বস্তুতঃ এ-সিজ্‌দা প্রত্যেকের বিপরীত যৌনাঙ্গ প্রণাম। উদ্দেশ্য ও প্রার্থনা—'যেন ঐ দ্বার দ্বারা পুনর্বার বহির্গত না হই'। অর্থাৎ আর যেন পুর্নজন্ম না হয়। (বৌদ্ধদের মতই বাউলদের মধ্যেও বিশ্বাস আছে যে, মানুষ চুরাশী 'লক্ষবার যোনিভ্রমণ' ক'রে বিভিন্ন জন্মে বিবিধ কর্মের মধ্য দিয়ে মুক্তির পথে অগ্রসর হয়।)

তারপর সকলে 'দায়রায়' বসেন। উপবিষ্ট ও চলমান অবস্থা ভেদে দায়রা দু'রকম। দায়রা চল্‌তি ও পায়রা চলতি। তাঁরা নারী-পুরুষ সকলে 'দায়রায়' আত্মবিস্মৃত হয়ে নৃত্য ও জিকির করতে থাকেন। আর উপবিষ্ট অবস্থায় প্রবল বেগে মাথা দোলানো, মৃত্তিকায় মাথা আছড়ানো এবং ভয়ঙ্করভাবে 'আল্লা 'আল্লা', 'হু' 'হু', 'আল্লা-হু', 'আল্লা-হু' কিংবা অনুরূপ শব্দোচ্চারণের সঙ্গে শরীর চালনা করতে হতে থাকে। সাধারণতঃ মধ্য ও শেষ রাতে 'দায়রায়' উপবিষ্ট হওয়াই রীতি।

ফকিরী 'দায়রা' সম্পর্কে আবদুল ওয়ালী লিখেছেন—The Muhammadan devotees (those who outwardly profess Muhamadanism),

I am told, repeat in prayer (bhajan) the Muhammadan recognised formulae. This they do only outwardly, but in reality their practices are as depraved and immoral as those of the others.[১১]

এ বিবরণ কিয়ৎপরিমাণে সত্য। কেননা, সকল বাউল ফকীর-ই ইস্‌লামের সঙ্গে তাদের ধর্মমতের সংযোগ দেখাবার ভানমাত্র করে না; বরং তাঁরা তাঁদের-ধর্মকেই ইসলাম বলে জানে।

'উচিত কথা'-পুস্তকে বিভিন্ন সাম্প্রদায়ের ছ'রকম জিকিরের বিবরণ আছে। কিন্তু আবদুল ওয়ালী সেগুলো উদ্ধৃত করেননি।

মওলানা রেয়াজ উদ্দীন 'নৈশ-মিলনে'র জিকির ও 'সংগীত-সাধনা'কে "বাউল ফকীরগণের ছেমা" (সামা) ব'লে উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন----"বাউল ফকীরগণ স্ত্রীলোক ও পুরুষ একত্রে খঞ্জরী, জুড়ী, খমক বাজাইয়া, 'গাজা' ভাঙ্ ও মদের নেশায় তালে তালে, ভাবে ভাব মিশাইয়া নর্ত্তন, কুর্দ্দন ও বাউল সুরে দেহ-তত্ত্ব গান করিয়া থাকে এবং যাহার সহিত যাহার ইচ্ছা, তাহা করিতে পাপ মনে করে না। ইহাকেই তাহারা মারূফতি ফকিরী ছেমা (সামা) নামে অভিহিত করিয়া থাকে ও খোদাপ্রাপ্তির সোপান বলিয়া জ্ঞান করে।"[১২] এবিষয়ে মওলানা আকরম খান ও লিখেছেন---"এই ভিক্ষোপজীবী ফকিরগণের 'ইচ্ছা পূরণ ভজন' নামে এক বিশেষ প্রকারের গোপন সাধন-রীতি রহিয়াছে। ইহার প্রধান বৈশিষ্ট্য হইতেছে ইহাতে কোন পুরুষ বা নারী তাহার নিজেদের বা দলের অপর কাহারো যৌন আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত করিতে ইতঃস্ততঃ বা কোনরূপ লজ্জা বোধ করিবে না। এই উদ্দেশ্যে হতভাগ্য এই ফকির-দলের নারী-পুরুষ সকল ভক্ত "আখড়া" নামক একটি বিচ্ছিন্ন স্থানে আসিয়া মিলিত হইয়া নানা দ্রব্য সেবন করে এবং যাহাকে যাহার ইচ্ছা তাহার সহিত-যৌন-সঙ্গমে লিপ্ত হইয়া তাহাদের নিগূঢ় সাধনা চালাইয়া যায়। যদি দলের কোন নারী বা পুরুষ অন্য কোন পুরুষ বা নারীর যৌন-কামনা চরিতার্থ করিতে অসম্মতি জ্ঞাপন করে, তাহা হইলে তাহাকে মহাপাপী বলিয়া অভিযুক্ত করা হয়। তান্ত্রিকদের মাতঙ্গী সম্প্রদায়ের 'মাতরমপি ন ত্যাজয়েৎ' সূত্রের ন্যায় এই মুছলিম ফকিরের দলও নিম্নোক্ত সূত্র উদ্‌ভাবন করিয়াছে: 'যখন তুমি তোমার

পিতার মস্তিষ্কে ছিলে, তখন যে নারীকে তুমি মা বলিয়া সম্বোধন করিতেছ সেই নারীর স্বামী ছিলে।..নারী গঙ্গা স্বরূপিনী এবং পুরুষ তাহাতে স্নানার্থী তীর্থ-যাত্রী।..গঙ্গা-স্নানে কাহারো ইতস্ততঃ করার কারণ নাই।"[১৩] বাউলদের নৈশ-মিলন সম্পর্কে রেয়াজ উদ্দীন আহমদ ও আকরম খানের বক্তব্য বিদ্বেষপ্রসূত বিধায় তাঁরা 'ইচ্ছা পূরণ ভজন'-এর তান্ত্রিক তাৎপর্য উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছেন। এজন্য নির্বিচার যৌন-মিলন-ই বাউলদের সাপ্তাহিক নৈশ-মিলনের একমাত্র উদ্দেশ্য বলে বর্ণনা করেছেন। তবে 'নারী যে গঙ্গাস্বরূপিনী' সে বিশ্বাস কোন কোন বাউল-সম্প্রদায়ে বর্তমান।[১৪] এ সম্পর্কে পূর্বোক্ত সমালোচকদ্বয়ের বক্তব্য সঠিক।

মুসলিম সূফী ফকীর সমাজে নৈশ-মিলন ভারতের নানা স্থানে অনুষ্ঠিত হবার খবর জানা যায়। খ্রীস্টান ধর্মাবলম্বী জন. এ. সোবহান উত্তর ভারতের তিন শ্রেণীর সূফীদের নৈশ-মিলনের বিবরণ দিয়েছেন। এ নৈশ-মিলনসমূহে তিনি স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। এমন একটি নৈশ-মিলন মঙ্গলবার রাতে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্প্রদায় কর্তৃক আয়োজিত 'দায়রায়' তিনি পুরুষ ব্যতীত কোন নারীর উপস্থিতির উল্লেখ করেননি।[১৫] কিন্তু বাউলদের নৈশ-মিলনে নারীর উপস্থিতি অনস্বীকার্য।

বস্তুতঃ সম্প্রদায়গত সামাজিক সংহতি ও ধর্মাচার রক্ষার নিমিত্ত বাউল সমাজে সাপ্তাহিক সাধন-ভজনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে নৈশ-মিলন-ক্রিয়া, জিকির, গীত-বাদ্য অনুষ্ঠিত হয়; যৌন-যথেচ্ছাচার হয়তো এর উদ্দেশ্য নয়।

উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য এ সম্পর্কে কোন আলোকপাত করেননি। অন্য কারো রচনা থেকেও এ সম্পর্কে বিশেষ কোন তথ্য লাভ করা যায় না।

গোপী-চক্র

আকরম খান মুসলিম ফকীরদের মধ্যে এক বিশেষ ধরনের অনুষ্ঠানের প্রচলন আছে বলে উল্লেখ করেছেন—যা গোপী-চক্র' নামে অভিহিত। কিন্তু তিনি একে 'গোপী-চক্র" বলেননি। তাঁর বর্ণনানুসারে 'পীর' বা 'গুরু'কে ভজন করার জন্য "এই মুছলিম ভিক্ষোপজীবী নেড়ার

ফকীর দল"----"শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক গোপিনীদের বস্ত্রহরণের অনুরূপ এক অভিনয়ের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। যখন পীর তাঁহার মুরীদানের গ্রামে তশরিফ আনেন, তখন গ্রামের সকল যুবতী ও কুমারী উত্তম বসনে সজ্জিতা হইয়া বৃন্দাবনের গোপিনীদের অনুকরণে একটি গৃহকক্ষে পীরের সহিত মিলিত হয়। নাটকের প্রথম অঙ্কে এই সকল স্ত্রীলোক নৃত্যগীত শুরু করে।... (অতঃপর) সমস্ত নারী তাহাদের গাত্রাবরণ খুলিয়া ফেলিয়া সম্পূর্ণ উলঙ্গ হইয়া পড়ে এবং ঘুরিয়া ঘুরিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে। পীর এখানে কৃষ্ণের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন এবং শ্রীকৃষ্ণ যেমন গোপিনীদের বস্ত্রহরণ করিয়া বৃক্ষে আরোহন করিয়াছিলেন, তিনিও তদ্রূপ এই সমস্ত উলঙ্গ নারীর পরিত্যক্ত বস্ত্র তুলিয়া লইয়া গৃহের একটি উঁচু তাকে রক্ষা করেন। এই পীর কৃষ্ণের যেহেতু বাঁশী নাই, তাই তিনি নিম্নোক্ত ভাবে মুখে গান গহিয়াই এই সব উলঙ্গ রমণীগণকে যৌনভাবে উত্তেজিত করিয়া তুলেন: "হে যুবতীগণ, তোমাদের মোক্ষের পথ ভক্তকুলের পুরোহিতকে অর্ঘ্য স্বরূপ দেহদান কর।"[১৬] এ উক্তি সত্য, কেননা, আনুষ্ঠানিক যৌথ যৌনমিলন অতি আদিমকাল থেকেই কোন কোন জনসমাজে ধর্মকৃত্যের অঙ্গ। বজ্রযানী বৌদ্ধদের যোগিনী-চক্র, তান্ত্রিক ভৈরবী-চক্র, বৈষ্ণব সহজিয়া রাস-চক্র এবং পূর্বোক্ত বাউল গোপী-চক্র অভিন্ন তাৎপর্য ও একই ঐতিহ্যে পরস্পর গ্রথিত।

গোপী-চক্রের আনুষ্ঠানিক বিধিও বিচিত্র এবং গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। বাউল গোপী-চক্রে সাধারণতঃ অবিবাহিতা, সুন্দরী, স্বাস্থ্যবতী, সদ্বংশজাত তরুণী কিংবা বালবিধবা, গৌরবর্ণা যুবতীদের আনয়ন করা হয়। তারা প্রত্যেকে সমাগত সাধকদের একটি রুদ্ধদ্বার গৃহের মধ্যে নগ্নাবস্থায় অভ্যর্থনা করে। সে ঘরে সকলকেই নগ্নাবস্থায় অবস্থান করতে হয়।

গভীর রাত্রে সমাগত প্রত্যেক নারী, প্রত্যেক পুরুষকে সেবাদান করে। সেবা তিন প্রকার--কায়িক, বাচিক ও মানসিক। কায়িক সেবা--প্রথম, এ সেবা নানা রকম। চরণ সেবা, জল সেবা, তেল সেবা, বেসর সেবা, অন্নসেবা বা পানীয় সেবা, আচমন সেবা প্রভৃতি।

গোপী-চক্রের প্রথমে প্রত্যেক পুরুষকে এক এক জন স্ত্রীলোক পা' ধুইয়ে দিয়ে, চুল দিয়ে পা' মুছিয়ে নগ্নাবস্থায় কোলে তুলে ঘরে নিয়ে

যায়। পরে সর্বাঙ্গে তেল অনুলেপন করে, আহার দান কিংবা উত্তেজক পানীয় পান করায়। তারপর শক্তি বামে রেখে সকলে চক্রাকারে উপবিষ্ট হ'য়ে কামোত্তেজক সঙ্গীত দ্বারা সাধন-ভজনে রত হয়। এচক্রে কখনও কখনও 'শারাবন তহরা' বা ফকিরী চারি পেয়ালা পরিবেশন করা হয়। রজঃ, বীর্য, মল, মূত্রে তৈরী চারি পেয়ালা যথাক্রমে নুর পেয়ালা, জহরী পেয়ালা, জব্বুরী পেয়ালা ও সত্তারী পেয়ালা নামে অভিহিত। এ ছাড়া উক্ত চক্রে, 'পঞ্চামৃত', 'প্রেম-ভাজা' প্রভৃতিও প্রদত্ত হয়।

নারী পুরুষের রজঃ-বীর্য মিশ্রিত দ্রব্য সহযোগে তৈরী পিস্টক-ই 'প্রেম-ভাজা'।

গোপী-চক্রের আরও কিছু খুঁটিনাটি ক্রিয়া আছে। সে-সবের বিবরণ অনাবশ্যক। বাউলগানে চারি পেয়ালার উল্লেখ আছে, কিন্তু 'গোপী-চক্রে', 'প্রেম-ভাজা', 'পঞ্চামৃত' কিংবা 'শারাবন তহরা'র বিশেষ কোন বিবরণ দেখা যায় না।

পূর্বে বলা হয়েছে, বাউলদের 'গোপী-চক্রে'র সঙ্গে তান্ত্রিক 'ভৈরবী চক্র' বজ্রযানী বৌদ্ধদের 'যোগিনী চক্র' কিংবা 'মণ্ডল চক্রে'র বিশেষ কোন ভেদ নেই। ধর্মানুষ্ঠান হিসেবে এ জাতীয় চক্রোপাসনা ভারতীয় উপ-মহাদেশের বিভিন্ন স্থানে সুদূর অতীতকাল থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত প্রচলিত ছিল ও আছে।

অক্ষয়কুমার দত্ত কাটিবার দেশের গির্ণার অঞ্চলের একধরনের সাধকদের মধ্যে অনুষ্ঠিত এরূপ 'চক্রে'র বিবরণ দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন---"শুক্লপক্ষীয় চতুর্দ্দশীতে ঐ চক্রের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। কোন বীজ-মার্গী নিজ বাটীর স্ত্রীলোক বিশেষকে কোন সাধুর বা উদাসীন বিশেষের সহিত সহবাস করাইয়া তাহা হইতে শুক্র নির্গত করাইয়া লয়। এই বীজ এক শিশিতে পুরিয়া রাখে ও চক্রের দিবসে ঐ শুক্র সমাজগৃহে আনয়ন পূর্বক একটি বেদীর উপর পুষ্প-শয্যার মধ্যস্থানে একটি পাত্রে স্থাপন করে এবং তাহাতে দুগ্ধ, মধু, ঘৃত, দধি মিশ্রিত করিয়া পঞ্চামৃত প্রস্তুত করে। সেই পঞ্চামৃত ঐ পাত্রে সংস্থাপন করিয়া পুষ্প ও মিষ্টান্ন দিয়া ভোগ দিয়া সমাজস্থ সকলকে পরিবেশন করিয়া দেয়।"[১৭] সম্প্রদায়টি ঐ দেশে 'বিসা-মারগ বা বীজমার্গী নামে খ্যাত।

দয়ানন্দ সরস্বতী বামাচারী তান্ত্রিকদের একটি শাখার এরকম চক্রোপাসনার বিবরণ দিতে গিয়ে লিখেছেন: ...বামাচারীরা একদল নর-নারীর জন্য অন্য লোকের অগম্য একটি নির্জন স্থানে মিলিত হইয়া ভৈরবী-চক্র নামে একটি চক্র রচনা করিয়া উপবেশন করে অথবা দণ্ডায়মান হয়। এই কামুক দলের সকল পুরুষ একজন স্ত্রীলোককে বাছিয়া লইয়া তাহাকে বিবস্ত্র করিয়া তাহার পূজা করে। অনুরূপ সকল নারী একজন পুরুষকে বাছিয়া বাহির করে এবং তাহাকে উলঙ্গ করিয়া পূজা করে। পূজা পর্ব শেষ হওয়ার পর শুরু হয় উদ্দাম মদ্যপানের পালা। মদ্যপানের ফলে যৌন উত্তেজনা বৃদ্ধি পাইলে পরিধানের সকল বস্ত্র ছুড়িয়া ফেলিয়া তাহারা সম্পূর্ণ উলঙ্গ হইয়া পড়ে এবং যাহাকে যাহার ইচ্ছা তাহার সহিত এবং যত জনের সঙ্গে সম্ভব তত জনের সঙ্গে অবাধ যৌন সঙ্গমে মাতিয়া উঠে। যৌনসঙ্গী যদি মাতা, ভগ্নী অথবা কন্যাও হয় তাহাতেও তাহাদের কিছু যায় আসে না।"[১৮]

বামাচারী তান্ত্রিক 'চোলমার্গী'রা অনুরূপ চক্রোপাসনার জন্য---"কোন গুপ্ত স্থানে অথবা ভূমিতে এক গুপ্ত স্থান নির্মাণ করে। সেই স্থানে সকলের স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বালিকা, ভগ্নী, মাতা ও পুত্রবধূ প্রভৃতিকে একত্র করিয়া সকলে মিলিয়া ও একত্র হইয়া মাংস ভোজন ও মদ্যপান করত একটি স্ত্রীকে বিবস্ত্র করিয়া সকল পুরুষে উহার গুপ্ত ইন্দ্রিয়ের পূজা করে ও তাহার নাম দুর্গা দেবী রাখে। এইরূপে সকল স্ত্রীলোকে এক পুরুষকে বিবস্ত্র করিয়া তাহার গুপ্তেন্দ্রিয়ের পূজা করে। যখন উপর্যুপরি মদ্যপান করিয়া উন্মত্ত হইয়া পড়ে তখন সকল স্ত্রীলোকের বক্ষবস্ত্র অর্থাৎ কাঁচুলি একত্র করিয়া একটা বড় গামলায় রাখিয়া এক এক পুরুষ উহাতে হস্ত দিয়া যে যাহার বস্ত্র প্রাপ্ত হইবে সে মাতাই হইক, ভগ্নীই হউক, কন্যাই হউক অথবা পুত্রবধূই হউক, সেই সময় সে তাহার স্ত্রী হইয়া যাইবে। তাহারা পরস্পরে কু-কর্ম করে এবং উন্মত্ততা অধিক হইলে জুতা প্রহরাদি করিয়া কলহও করে, প্রাতঃকালে একটু অন্ধকার থাকিতে (তাহারা) গৃহে চলিয়া যায় এবং তখন যে যাহার মাতা, কন্যা, ভগ্নী অথবা পুত্রবধূ সে তাহাই হইয়া থাকে।"[১৯]

শুধু বামাচারী বীজ-মার্গী কিংবা চোল-মার্গী তান্ত্রিকদের মধ্যেই নয়, শিব-চতুর্দশীতে বাঙলাদেশের কোন কোন শৈব, শাক্ত অঘোরপন্থী, অশোকপন্থী, মার্গ-সাধন পন্থী, সখী ভাবকী, কিশোরী ভজা-বৈষ্ণব

প্রভৃতি সম্প্রদায়ে এরূপ চক্রানুষ্ঠান হয়ে থাকে। এঁদের এরূপ অনুষ্ঠান সম্পর্কে আবুল হাসানাৎ তাঁর 'যৌন-বিজ্ঞান' গ্রন্থে 'ধর্ম ও প্রথাগত যৌন কদাচার'-এর উদাহরণ স্বরূপ নন্দ গোপাল সেন গুপ্তের বিবরণ উদ্ধৃত করে লিখেছেন——শৈব সম্প্রদায় বিশেষে "দশ-মহাবিদ্যার প্রতীক রূপে দশটি অজাতঋতু বালিকাকে স্নান করিয়ে বিবস্ত্র বেশে ও বিস্রস্ত কেশে মৃত্তিকা নির্মিত ছোট ছোট বেদীতে বসানো হয় এবং ফুল বিল্বপত্র ও আতপ চাউল সহযোগে তাহাদের যোনিদেশের পূজা করা হয়। এইভাবে তাহাদের যোনিদেশে গৌরীপীঠের প্রতিষ্ঠা হলে শিব রূপী এক ভৈরব তাদের কৌমার্য হরণ করেন। এই ভৈরবের উচ্ছিষ্ট লিঙ্গকে দুধ এবং গঙ্গাজল দিয়ে পূজা করা হয়----তারপর তিনি নির্মলচিত্তে শিব-মহিমায় সমাবিষ্ট হয়ে প্রত্যেকটি মহাবিদ্যার গৌরীপীঠে শিব-প্রতীক সন্নিবিষ্ট করেন। সাধারণতঃ একজন ভৈরবের পক্ষে এতগুলি গৌরীর কৌমার্য ভেদ সম্ভব নয় বলে তিনি প্রতিনিধি নিয়োগ করেন অর্থাৎ তাঁর প্রিয় অনুচরদের কারুর কারুর লিঙ্গদেশ স্পর্শ করে দেন, তখন এক দিকে অপরিণত বালিকাদের আর্তনাদ, অন্যদিকে শিবানুচরদের সংকীর্তন শুরু হয়, আর তারি ভেতর 'গৌরীগরণ' (গৌরী গ্রহণ?) অনুষ্ঠিত হতে থাকে। এই অনুষ্ঠানের রক্তে নিষিক্ত ন্যাকড়া 'সিদ্ধ বস্ত্র' রূপে সমাজে চলে——রোগ বিনাশ, শত্রু-নিপাত, মামলা-জয়, পরীক্ষা-পাস ইত্যাদি ব্যাপারে বিশেষ ফলদপ্র বিশ্বাসে অনেকে তা' সংগ্রহ করে রাখেন, মাদুলীতে ধারণও করেন। কিন্তু জিনিসটা কি তা' হয়তো অনেকেই জানেন না।

উত্তর রাঢ়ের কোন কোন অঞ্চলে এ অনুষ্ঠান চলিত আছে। 'শিব চতুর্দ্দশীর রাত্রে অত্যন্ত গোপনে ব্যাপারটি নিষ্পন্ন হয়। এই ভাবে এক শো আটটি কুমারী ভেদ করতে পারেন যে ভৈরব, তিনি নাকি পুরোপুরি শিবের পদবী লাভ করেন। এরকম একাধিক শিবের অস্তিত্বের খবর আমি শুনেছি।

বামাচারী শাক্তদের মধ্যেও এই রকম এবং আরো অনেক রকম বিশ্রী ব্যাপার প্রচলিত আছে। তারা 'ক্রিয়া' নামে যে পারিভাষিক শব্দটি ব্যবহার করে থাকেন, তার আসল অর্থ হল, বিবসনা বালিকার প্রতিনিধি রূপিনী একটি কৃষ্ণাঙ্গী নারীকে সংগ্রহ করে মদ্যপানান্তে তার সঙ্গে অস্খলিত মৈথুনে প্রবৃত্ত হওয়া। কৌল মণ্ডলীর আচার্য যিনি

তিনিই এই অনুষ্ঠানে ভৈরবের ভূমিকা নেন এবং ভক্তমণ্ডলী গীত-বাদ্য সহযোগে অনুষ্ঠানটির সৌকর্য বিধান করেন। কিন্তু ধারক শক্তির ন্যূনতাবশতঃ অনিবার্যভাবেই স্খলন হয়----কাজেই এই ভৈরবের পক্ষে সমগ্র লগ্নকাল কুম্ভক-সঙ্গমে লিপ্ত থাকা সম্ভব হয় না, ভক্তবৃন্দ তাই উপর্যুপরি সঙ্গমানুষ্ঠান করতে করতে আসর জমিয়ে রাখেন।

অঘোর পন্থা, অশোক পন্থা, মার্গসাধন পন্থা, আরো নানা শ্রেণীর তন্ত্রাচার চলিত আছে, যা বিকৃত যৌনাসক্তির বীভৎস নিদর্শন হিসাবে উল্লেখযোগ্য----এই সব দলের, এক ব্যক্তি একদা মৃতা নারী রমণের অপরাধে ধরা পড়েছিল---কোন অপরাধের ভাব না দেখিয়ে সে বললো যে,...ভূতসিদ্ধি লাভের উপায় হিসাবেই সে এই কার্য করে। এতে আমাদের সকলেরই কল্যাণ হবে।...

(এছাড়া) পাঁচজন কৃষ্ণকায় নারী থেকে যথাক্রমে ঋতু-শোণিত, মূত্র, যোনি-দ্রাব, নিষ্ঠিবন ও সঙ্গমক্লেদ সংগ্রহ করে তার ন্যাকড়া পঞ্চপুষ্প নামে ব্যবহার করা----অর্থাৎ অঙ্গে ধারণ করা, যজ্ঞাগ্নিতে আহুতি দেওয়া, প্রদীপ জ্বালিয়ে যোনি ও লিঙ্গের আরতি করা···মূত্রপান, শুক্রসেবন, যোনি লেহন, পায় লেহন, মুণ্ডিত যৌন-কেশের ভস্ম ত্রিপুণ্ড ললাটে ধারণ, এমন কি পশু মৈথুনও কোন সম্প্রদায়ের স্ত্রী-পুরুষে তন্ত্রাচার রূপে অনুষ্ঠান করে।...

এক শ্রেণীর শক্তি-সাধিকা আছে, যারা বাহ্যতঃ পুংসংস্রব বর্জন করে চলে---এদের দেশজ নাম কারুণী---এদের মধ্যে একজন ভৈরব রূপে অন্যান্য নারীতে উপগত হয়।...এই সম্প্রদায়ের আখড়া পশ্চিম বঙ্গে কোথাও কোথাও আছে শোনা যায়, কিন্তু গৃহস্থ ঘরের বাল্য বিধবাদের মধ্যে গোপনেই এর চলন বেশী। আবার শক্তি সম্পর্ক-হীন পুরুষাচারী তান্ত্রিকও আছে----যারা কোন অভিপ্রেত বালককেই ভৈরবী রূপে গ্রহণ ও রমণ করে।...

বৈষ্ণবদের মধ্যেও বহু রকমের যৌনবিকৃতি প্রচলিত আছে, যার খবর হয়ত কেউ কেউ অল্পবিস্তর রাখেন। গোপীভাবে ভজনার নামে পুরুষের কৃত্রিম স্তনধারণ, শ্মশ্রুগুম্ফ মুণ্ডন, ঘাঘরা ও অলঙ্কার পরিধান, মাসে মাসে কৃত্রিম ঋতু পালন ইত্যাদি কোন সম্প্রদায়ের ভেতর সাধনার অঙ্গ হিসাবেই চলিত আছে।...

বৈষ্ণবের 'কিশোরী ভজন' অনুষ্ঠানও অনেকটা শৈবদের গরনের মতো ব্যাপার——অক্ষত যোনি অনুদ্‌গত যৌনকেশা ব্রজ-কিশোরীদের (কৃষ্ণ যাঁদের বস্ত্রহরণ করেছিলেন) প্রতীকরূপিনী কুমারীদের সংগ্রহ করে কৃষ্ণরূপী গোঁসাই তাদের কৌমার্য ভেদ করেন----তারপর কৃষ্ণের নামে উৎসর্গিত সেই কিশোরী অপরাপর ভক্তের সেব্য হয়। এখানে মৃদঙ্গ মন্দিরা বাজে, নাম সঙ্গীত হয়।...সহজিয়া বৈষ্ণবদের প্রেম-চর্চিকা বা প্রেম-চর্চরী অনুষ্ঠানে ... খুব গোপনে কোন কোন আখড়ায় প্রচুর পরিমাণে ময়দা ঢেলে, তার ওপর রাধাকৃষ্ণ ব্রজলীলায় ব্যাপৃত হয়, তারপর সেই ময়দার লুচি বানিয়ে ভক্তজনের মহোৎসব ও গান-কীর্তন হয়। এ ছাড়া বাল গোপাল রূপে বয়স্ক ভক্ত কর্তৃক যুবতীদের ক্রোড়ে আরোহণ, স্তন পান, অথবা নন্দকিশোর রূপে কুমারীদের সঙ্গে দোল, রাস, ঝুলন এবং বস্ত্রহরণ ইত্যাদিও অভিনয় হয়ে থাকে——আর সে সব কুমারী সংগৃহীত হয় গৃহাস্থাঞ্চল থেকেই এবং অনেক স্থলেই কুমারী নামে তার ভেতর বিধবা, বিবাহিতা, এমন কি বেশ্যাও থাকে। গোষ্ঠলীলা রূপে পুংমৈথুনও চলে প্রচুর পরিমাণে।...

আউল, বাউল, দরবেশ, কর্তাভজা ইত্যাদি অন্যান্য সহজিয়াদের মধ্যেও এই রকম বা আরও অনেক রকম কদনুষ্ঠান চলিত আছে। পুরুষে পুরুষে ও নারীতে নারীতে সমমৈথুন, শুক্র-শোণিত পান, যোন্যবলেহন, যৌনাঙ্গ পূজা ইত্যাদি এই সব সম্প্রদায়ের মধ্যেও পূজা-পদ্ধতির অনুষ্ঠান হিসাবেই স্বীকৃত ও অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। শুক্র সংমিশ্রিত সরবৎকে এঁদের কোন কোন দল 'সুধা' বলেন, ঋতুসিক্ত ন্যাকড়াকে বলেন 'বজ্র' এবং তা গুপিযন্ত্র বা একতারাতে সন্নিবিষ্ট করে রাখেন। অপরাজিতা ফুল যোনির প্রতীক বলে তাকে এঁরা 'টোটেম' হিসাবে ব্যবহার করেন——যোনি বা পায়ু সংস্পৃষ্ট ঝুমকো জবা ঠিক কি কারণে ব্যবহৃত হয় বলতে পারি না, তবে তা' দিয়ে একাধিক করণ হয় শুনেছি। আসলে শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব যে কোন পর্যায়ের সহজিয়াই কতকগুলি আনুষ্ঠানিক বিভিন্নতা সত্ত্বেও একই ধরনের যৌনাপচার করে থাকেন, এতে মনে হয় আদিম মানুষের যৌনারাধনা নানা রূপান্তরের মধ্য দিয়ে আজো অব্যাহত ধারায় বয়ে চলেছে, আর শাস্ত্রাদেশের বিকৃত ব্যাখ্যান দিয়ে তাকে টিকিয়ে রাখা হচ্ছে।...

কিন্তু গোষ্ঠীবদ্ধভাবে ধর্মাচরণে নিরত নরনারীরই যে কেবল বিকৃত যৌনাচার করে তা নয়। বিশেষ কোন সম্প্রদায়ের মার্কা-মারা নয়, এমন অনেক দলও দেখা যায়, যারা ধর্মাচরণের নামে অনেক রকম অপচার করে থাকে।----...এক অবধূত তাঁর উচ্ছ্রিত ও উন্মুক্তাগ্র জননেন্দ্রিয় দিয়ে ভারোত্তলন করে মহিলাদের নমস্য হয়ে উঠেছিলেন মুর্শিদাবাদে---পায়ু ও লিঙ্গের দ্বারা জলপান করে গ্রাম্য নরনারীকে অবাক করে দেওয়ার আর একটা ঘটনাও শুনেছি----ঘন্টাব্যাপী অবিরাম মৈথুনেও শুক্রপাত না হতে দেবার আস্ফালন করে যে কোন নারীকে তা' পরীক্ষা করে দেখতে আহ্বান করেছিলেন আর এক সিদ্ধ পুরুষ এবং গ্রাম্য নারীরা বাবার বিভূতি পরীক্ষা করার মানসে এক গোয়াল ঘরে সমবেত হয়ে কোন এক নষ্টা নারীকে এই কাজে নিয়োজিত করেছিল এবং শুনেছি বাবার আশ্চর্য ক্ষমতায় বিমোহিত হয়ে তাঁকে দেবতা বলেই স্বীকার করে নিয়েছিল। বাবা নাকি বলেছিলেন, 'অতএব বুঝতে পারছ এ সঙ্গম নয়।' প্রত্যক্ষদর্শী এই বিবরণ বলতে বলতে ভক্তিতে আর্দ্র হয়ে উঠেছিলেন।

ত্রিপাদ দোষ থেকে এক মৃত তরুণীকে মুক্ত করার জন্যে এক সন্ন্যাসী তার যোনিতে শুক্রক্ষেপ করে মন্ত্রোচ্চারণ করে দিয়েছিলেন---- আর বলেছিলেন যে এই যে মেয়ে তিন মাসের মধ্যেই আত্মীয়-স্বজনের কারুর না কারুর গর্ভে সন্তানরূপে আবির্ভূত হবে। দর্শকদের বক্তব্য যে, সত্য সত্যই তা হয়েছিল----সেই চোখ, সেই নাক ইত্যাদি।"...[২০]

এসব উদ্ধৃতি পর্যবেক্ষণ করলে লক্ষ্য করা যায় লেখকগণ নিরপেক্ষ ভাবে ঐ সব ধর্ম-সম্প্রদায়ের চক্রোপাসনার বিবরণ দেননি। বরং তাঁদের বর্ণিত ঘটনা বিদ্বেষ প্রসূত বিধায়, তা' যথাযথ প্রেক্ষিতে উপস্থিত হয়নি। নন্দগোপাল সেনগুপ্ত অবশ্য যথার্থই বলেছেন—এসব, আদিম সমাজের যৌনারাধনার অবশেষ (ও বিকৃতি)। কিন্তু উক্ত ক্রিয়ার বাহ্যচরিত্র কদর্য, নৃশংস ও অসুস্থ মানসিকতাজাত বিকৃত যৌনাচরণ বলে প্রতিভাত হলেও মূলতঃ যে সেগুলো ধর্মীয় বিশেষকৃত্য রূপেই বিবেচ্য তা' 'গৌরীগরণ', 'কিশোরী ভজন', প্রভৃতি নামকরণ এবং কুমারীদের বিশেষ বিশেষ সংখ্যা-নির্দিষ্টতা, আর ঐসব ক্রিয়া দ্বারা লব্ধ 'বিভূতি'-অর্জন থেকে বোঝা যায়। পূর্বোক্ত 'ভার-উত্তোলন',

দুধ কিংবা জল-শোষণ, অব্যাহত সঙ্গম ইত্যাদি---নানা শ্রেণীর বাউল সাধকগণের সিদ্ধিলাভের নিদর্শনরূপে প্রচারের খবর অসত্য নয়। বাউলগণ সাধনার দ্বারা সত্যি সত্যিই এরূপ ক্ষমতা লাভ করতে সক্ষম হ'তে পারেন। কিন্তু তার সঙ্গে গোপী-চক্রের বিশেষ কোন সংযোগ নেই। বরং ঐসব ক্ষমতা লাভের সঙ্গে যোগের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান। দ্বিতীয়তঃ প্রাগুক্ত ঘোর তান্ত্রিকাচার সকল বাউল সম্প্রদায়ে অনুপস্থিত। 'গোপী-চক্র'ও সকল বাউল-সম্প্রদায়ে অনুষ্ঠিত হয় না। আবার বাউল মাত্রেই গোপী-চক্রে গমন করেন না। অতএব 'গোপীচক্র' বাউল-সম্প্রদায়ে কোন অপরিহার্য ধর্মকৃত্য নয়।

৩ পাক্ষিক ক্রিয়া : চন্দ্রসাধন

উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বাউলদের 'চারিচন্দ্র-সাধন' সম্পর্কে আলোচনা শেষে বলেছেন----"বাউলেরা এই ক্রিয়াগুলি করে সাধারণতঃ পক্ষান্তে বা পনের দিন পর পর। কারণ প্রবর্তনের সময় একটি কি দুইটি বস্তু--রজঃ বা রজো-বীজ মিলিত অবস্থায় পান করা হয়। যাহারা মিলিত বস্তু পান করে না, তাহারা কেবল রজঃই পান করে। যাহারা এই মিলিত বস্তু পান করে, তাহারা তিন মাস বা ছয় মাস বা এক বৎসর অন্তর সাধিকার জিহ্বা দ্বারা মোক্ষিত বীজ পান করে। সমস্ত পান সাধক ও সাধিকা উভয়ই করে।"[২১] লেখকের এ বিবরণ সার্বভৌম সত্য নয়। পূর্বেই আলোচিত হয়েছে, বাউলগণ নিত্যক্রিয়ার অঙ্গরূপে চন্দ্র-সাধন করে। সেক্ষেত্রে চারি চন্দ্রের মধ্যে মাত্র দুটি চন্দ্র 'মাটি' ও 'রস' সাধনই নিত্যক্রিয়ার অন্তর্গত। অপর চন্দ্রদ্বয় 'রতি' ও 'শুক্লচন্দ্র'-সাধন পনের দিন পর পর নয়----এক এক মাস পরে করণীয়। মাসিক 'তিন দিনে'র ক্রিয়াতেই এদু'টি চন্দ্রের সাধন নির্দিষ্ট।

জনৈক লালনপন্থী বাউলের একটি গোপন-খাতায় পূর্ণিমাকালে রাতে চাঁদের দিকে তাকিয়ে নিম্নোক্ত 'মন্ত্র' বা 'দোয়া' আবৃত্তির কথা লেখা আছে।

কুকার লাল দোল ইয়াল
পেক লাক লে যাও
তক্ষনি অক্ষয় স্বরূপ আমায়
জলদিছে দেখাও।

'মন্ত্র'টি চাঁদের দিকে তাকিয়ে এক হাজার এক বার পঠনীয়।

এছাড়া পাক্ষিক ক্রিয়ার বিশেষ কোন বিধান বাউল সমাজে আছে কিনা বলা কঠিন।

৪ মাসিক (তিন দিনের) ক্রিয়া

বাউলগণ ধর্ম-সাধনার অপরিহার্য অঙ্গ স্বরূপ প্রতি মাসে নারী রজস্বলা হবার পর তিন দিন আপন উত্তর-সাধিকার সঙ্গে বিশেষ ধরনের যৌন-মিলন ও আনুষঙ্গিক ক্রিয়া পালন করেন। একে 'তিন দিনের ক্রিয়া', 'যোগ-পাক ক্রিয়া', 'গুণবানের ক্রিয়া' প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হয়। সর্ববিধ বাউল গোষ্ঠীতেই এ-ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়। বস্তুত এই 'ক্রিয়া' দ্বারাই সর্বপ্রকার বাউল মতবাদীদের অন্যান্য অ-বাউল ধর্ম-গোষ্ঠী থেকে পৃথক করা যায়।

আলোচ্য 'ক্রিয়া'----সাধক-সাধিকা উভয়েরই যৌথভাবে করণীয়। তাই একে 'যুগল ভজন' বলে। উক্ত ক্রিয়ায় পরস্পর পরস্পরকে 'দেহ-দান' করা আবশ্যক। তাই একে 'দেহ ভজনা'ও বলে। এ সময় নারী-পুরুষ পরস্পর বিপরীত ধর্মী রসের বশবর্তী হয়ে আনন্দপূর্ণ মিলনে রত হয় বিধায় একে 'রসের ভজন' নামেও আখ্যায়িত করা হয়।

এ সম্পর্কে ইমাম উদ্দীন লিখেছেন----"বাউলদের নিকট হালাল-হারাম বলিয়া কিছু নাই। স্ত্রীর হায়েজের বা ঋতুর তিন দিন সহবাস হারাম। কিন্তু বাউল সাধনায় এই তিন দিনের সহবাস অতীব গুরুত্ব-পূর্ণ। ...স্ত্রী-রজের 'প্রথম বিন্দু পান' বাউল সাধনার একটি বিশেষ অঙ্গ। ...ইহা একটি জঘন্যতম কাজও বটে।"[২২] লেখকের আত্যন্তিক বাউল-বিদ্বেষ, বাউলদের আলোচ্য ক্রিয়ার মর্মানুধাবনে বাধার সৃষ্টি করেছে। অবশ্যই, বাউল-সম্প্রদায়ের হালাল-হারাম, পাপ-পুণ্য, রুচি-নীতি তথা মূল্যবোধ ---ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের থেকে পৃথক। সেজন্য, তাঁদের মধ্যে একেবারেই কোন হালাল-হারাম বোধ নেই, তা' বলা যায় না। বাউলগণ তত্ত্বতঃ ঋতুকাল ব্যতীত অন্য কখনো নারীর সঙ্গে যৌন-মিলনের পক্ষপাতী নন। কেননা, তাঁরা প্রাণীজগতের সঙ্গে বর্বর যুগের আদিম স্বাজাত্যবোধ বশেই অন্যান্য প্রাণীর মত

ঋতুকাল ভিন্ন নারী-সঙ্গম পাপজনক বলে মনে করেন। তাঁদের উক্তি ও যুক্তি নিম্নরূপ----

নিয়ম লঙিঘলে পাপ জ্ঞান সুনিশ্চয়।
নিয়ম অধীন দেখ পশুপক্ষী চয়॥...
ঋতু বিনা পশু আদি গমন না করে।
সে নিয়ম লঙ্ঘে পাপি মানব নিকরে॥...[২৩]

অতএব বাউলদের 'তিন দিনের ক্রিয়া' যুক্তিহীন কোন জঘন্য কাজ বলা চলে না।

বাউল-সাধনা মূলতঃ রসের সাধনা, তথা রজঃ বীর্যের সাধনা। এজন্য নারীর সর্বাধিক কামের সময়—রজঃকালীন তিন দিন, 'শুভ'যোগে, উক্ত রজঃ, যোগপাক দ্বারা মৈথুনের সাহায্যে অমৃতে পরিণত করে লিঙ্গনালে স্বদেহে গ্রহণ করার জন্যই ঋতুমতী নারীতে উপগত হওয়া অপরিহার্য।

অবশ্য সকল সম্প্রদায়ের বাউলরাই তিন দিবসের প্রতিদিন 'দেহ-মিলন' ও 'রজ পান' করেন না।

পাঞ্জু-সম্প্রদায়ের করণ

পাঞ্জ শাহী সম্প্রদায়ে 'রসের ভিয়ান' নারীর রজঃকালীন দ্বিতীয় দিন করণীয়। এ বিষয়ে পাঞ্জু শাহের নির্দেশ—

অধিকাংশ বাউল তিন দিন-ই যৌন-মিলনে রত হন। তার মধ্যে এক দিন মাত্র 'রসের ভিয়ান' বা 'যোগ-পাক' দ্বারা 'অমৃত' পান করণীয়। বিভিন্ন সম্প্রদায় বিভিন্ন দিন 'পান-ক্রিয়া' সমাধা করেন।

বাউলদের তিন দিনের বিশেষ পরিচয় ও তাৎপর্য নিম্নোক্ত ছকে প্রকাশ করা যায়:

নাম	প্রথম দিন	দ্বিতীয় দিন	তৃতীয় দিন
দিবাধিপতি	ব্রহ্মা	বিষ্ণু	মহেশ্বর
অধিদেবী [২৪]	রাধা	রুক্মিণী	কুব্জা
মানুষ[২৫]	সহজ	অযোনি	সংস্কারা
যোগ	অমাবস্যা	প্রথমা	দ্বিতীয়া
গুণ	সত্ত্বঃ	রহাঃ	তমঃ

নাম	প্রথম দিন	দ্বিতীয় দিন	তৃতীয় দিন
কাম	কাম	অকাম	মহাকাম
রস[২৬]	অমৃত	শম্ভু	গরল
রতি[২৭]	সামর্থা	সমঞ্জসা	সাধারণী
নদী[২৮]	গঙ্গা	যমুনা	সরস্বতী
স্নান	কারুণ্য	তারুণ্য	লাবণ্য

বাউলদের তিন দিনের গুপ্ত সাধন প্রক্রিয়া সম্পর্কে উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য লিখেছেন—"পর পর তিন দিনের মিলনকে বাউলরা 'রসের ভিয়ান' করা করা 'রসের পাক' করা বলে। যেমন ময়রা খোলায় রস চড়াইয়া ক্রমে ক্রমে অগ্নির তাপে কৌশলে আবর্তন করিতে করিতে রস গাঢ় করিয়া মিশ্রী প্রস্তুত করে, যেমন দধির মন্থনে মাখন উৎপন্ন হয়, সেই রূপ তরল বস্তু হইতে গাঢ় বস্তু উৎপন্ন করিতে হইবে। ...দুধ ও জল মিশ্রিত থাকিলে রাজহংস যেমন জল বাদ দিয়া দুধ পান করে, রসিক সাধকও সেইরূপ 'নীর' বাদ দিয়া 'ক্ষীর'কে গ্রহণ করিবে। বহু গানে এই 'নীর-ক্ষীর'-এর কথা আছে। এই পৃথক করা অর্থে আবর্তন বা মন্থন করা। মন্থনের দ্বারা 'নীর' হইতে 'ক্ষীর' পৃথক হইবে, 'কাম' হইতে 'প্রেম' পৃথক হইবে। এই শৃঙ্গার রস-রতিকে উজান করিবার জন্য। ইহা দ্বারা কাম নাশ হইয়া প্রেম ঊর্ধ্বগতি প্রাপ্ত হইবে—এইরূপ বলা হয়।

প্রকৃতি-দেহে রজো-বীজ মিশ্রিত আকারে আছে, তাহাকে পাত্রান্তর অর্থাৎ তাহার মধ্য হইতে বীজ অংশকে মন্থনের দ্বারা পৃথক করিয়া প্রেম-রূপে ঊর্ধ্বগামী করিতে পারিলে উত্তম রসের ভিয়ান করা হয়, বা রাজহংসের মতো আচরণ করা হয়। ইহাই বাউলের সাধনকার্য।"[২৯] উল্লেখযোগ্য যে, 'নীর'-'ক্ষীর', 'কাম-প্রেমে'র রূপক নয়, 'নীর-ক্ষীর' যথাক্রমে 'রজঃ-বীর্য' এবং ক্ষেত্রবিশেষে 'রক্ত' ও 'রজঃ রসের' রূপক। একে 'বিষ' এবং 'অমৃত'ও বলা হয়েছে। 'শৃঙ্গার নয়, বরং মিলন-ক্রিয়া বা মন্থনকারী মৈথুন ক্রিয়া দ্বারা সাধক নীরে ক্ষীর মিশিয়ে বা নারীরজের সঙ্গে স্বীয় বীজ নিষেক দ্বারা মিশ্রণ ঘটিয়ে মন্থনের সাহায্যে মিশ্রিত বস্তু থেকে রক্ত পৃথক ক'রে রস আহরণ করাই বাউল-দের রসিক ময়রার কার্য, রাজ-হংসের কার্য, দুধ থেকে মাখন বা ননী

নিষ্কাশনের কার্য কিংবা 'বিষ-জারণ' কার্য। লেখকের বিবৃতি অনুযায়ী প্রকৃতি দেহে 'রজো-বীজ' মিশ্রিত আকারে থাকে না, বরং মৈথুনের সাহায্যে রজঃ-বীজের মিশ্রণ ঘটাতে হয়, একেই বাউলদের তত্ত্বকাব্য ও গানে 'বস্তুর' পাত্রান্তর' বলা হয়েছে। তারপর সেই 'পাত্রান্তরিত বস্তু' সাধক পুনরায় মৈথুনের সাহয্যে অমৃতীকরণের পর বিশেষ প্রক্রিয়ায় স্বশরীরে উত্তোলন করেন। একেই 'রসের ভিয়ান' ও 'অমৃত পান' বলে। অতএব 'রসের ভিয়ান' অর্থ 'বীজের প্রেম-রূপে ঊর্ধ্বগামী হওয়া' নয়। বাউলরা পর পর তিন দিন-ই রসের ভিয়ান' করেন বলে উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য যে তথ্যের উল্লেখ করেছেন, তাও সার্বভৌম নয়, অধিকাংশ বাউল-সম্প্রদায় এক দিন মাত্র 'রসের ভিয়ান' করেন।

সম্প্রদায় ভেদে আলোচ্য 'তিন দিনের ক্রিয়া' নিম্নরূপে অনুষ্ঠিত হয়।

পাঞ্জ—সম্প্রদায়ের করণ

পাঞ্জ শাহ্ ছিলেন চিস্তীয়া তরিকার নিজামিয়া উপ-তরিকাশ্রয়ী সুফী ফকীর। তিনি তাঁর তত্ত্বকাব্য "ছহি ইস্কি ছাদেকী গওহোর" ও গীতাবলীতে তিন দিনের ক্রিয়ার যে ইঙ্গিত দিয়েছেন, তাতে বলা হয়েছে—

নিত্য নিত্য নূর ভাই উজান করিবে।
সাধনার মূল সাধন যোগেতে জানিবে*
অমাবস্যা প্রতিপদ দ্বিতীয়া জানিবে।
দ্বিতীয়ার প্রথমে সে ভিয়ান হইবে*[৩০]

অর্থাৎ পাঞ্জ শাহী-সম্প্রদায়ে তিন দিন-ই মিলন ক্রিয়া করা হয়, কিন্তু দ্বিতীয় দিনে ভিয়ান নির্দেশিত।

পাঞ্জশাহের গানেও বলা হয়েছে--শুভযোগে ক্ষীর-নদী যখন জোয়ারে প্লাবিত হয়, তখন সে যোগকে "অমাবস্যা কয়"। পাঞ্জমতে অমাবস্যা কিংবা প্রতিপদ-দিবসেও নয় দ্বিতীয়ার প্রথমে অর্থাৎ তৃতীয় দিনের প্রারম্ভ মুহূর্তে 'ভিয়ান' করা আবশ্যক। কবির কথায়—

অমাবস্যা তিথি নাস্তি
জোয়ারে তিথি উক্তি
অমাবস্যা, প্রতিপদ দ্বিতীয়া
তিন দিন চলে।

এই তিন দিনের শেষ দিনে ভাটার সময় "মানুষ" অচিন দেশে' বা 'গোলকে' মিশে যায়।[৩১] 'কিন্তু এ সম্পর্কে উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য লিখেছেন----"পাঞ্জ-সম্প্রদায় প্রথম দিনের প্রথম অংশে সানধ-ক্রিয়া করে না। ঐ দিনের পরবর্তী অংশে যখন জোয়ার উপস্থিত, তখন হইতে অমাবস্যা, প্রতিপদ, দ্বিতীয়া---এই তিন দিন তিথি বলিয়া গণনা করে।"[৩২] এ উক্তি সঠিক নয়। কারণ ড. ভট্টাচার্যের উক্তি অনুযায়ী ঐ সাধন-ক্রিয়া প্রকৃতির রজঃপ্রবৃত্তির চতুর্থ দিনে গিয়ে পড়ে, তাকে তিন দিনের মধ্যে গণনা করতে পাঞ্জ কখনও বলেননি। তিনি স্পষ্ট ভাষায় বহুবার বলেছেন----

প্রতিপদে কার্য নাই, তার
সাধন দ্বিতীয়ায়।[৩৩]

পাঞ্জ-সম্প্রদায় কর্তৃক 'ভিয়ান'কালে সাধকের 'ক্ষীর'-নিষেক নিষিদ্ধ। এজন্য পাঞ্জ শাহ্ বস্তুর পাত্রান্তরের নির্দেশ দেননি। বরং বলেছেন---

সাধনের নুর ভাই আধারে রাখিবে
মূলাধারে নীর এনে তাহে মিশাইবে* [৩৪]

আধার অর্থ পাত্র বা সাধকের নিজ দেহ। তা'হলে, পাঞ্জ-সম্প্রদায়ের করণ অনুযায়ী স্বাধিকার অগ্নিকুণ্ডে 'দুগ্ধ' নিক্ষেপ করে আবর্তন আবশ্যক নয়, বরং মৈথুন দ্বারা নারী রজঃ মধ্যস্থ 'রস' ও রক্ত পৃথকীকরণের পর পরিশুদ্ধ রস-ই 'মুদ্রা' বিশেষের সাহায্যে সাধক শরীরে---মূলাধারে উত্তোলন-ই মূল লক্ষ্য। অবশ্যই এ উত্তোলন লিঙ্গনালে করণীয়।

হাউড়ে সম্প্রদায়ের করণ

কিন্তু রাঢ়ের বাউল হাউড়ে-সম্প্রদায়ের সাধনপদ্ধতি কিছুটা স্বতন্ত্র। হাউড়ে তিন দিনের করণ সম্পর্কে বলেছেন----

তিন দিন বারুণী বারণ করি নি,
বারুণী যোগেতে স্নানে
পূর্ণ মনের বাসনা॥...[৩৫]

অতএব এ সম্প্রদায়ে রজকালীন তিন দিনই মিলন-ক্রিয়ার বিধি বর্তমান।

কিন্তু এই তিন দিনের প্রত্যেক দিন-ই 'পান-ক্রিয়া' অনুষ্ঠিত হয় না। এ সম্পর্কে হাউড়ের একটি গানে প্রথম দিনে পান-ক্রিয়ার আভাস দেওয়া হয়েছে। উক্ত গানে কবির বক্তব্য----'মানব-দেহরূপ প্রেম-রসের (খেজুর) গাছে রস আছে। সাদা, রাঙা, নীল ও সবুজ তার রঙ। সে রস দেহ-কলসে গ্রহণ করলে ---'ভূপতি হবে এই দেহ"। উত্তম গাছি এ গাছের সব দিনের রসই গ্রহণ করেন না। তিনি একমাত্র 'অতিশয় মিষ্ট জিড়েন রস----অর্থাৎ 'প্রথম দিনের বারি' পান করেন। এ 'বারি 'ঘোলা' না করে দেহ-কলসে গ্রহণ করা আবশ্যক। সেজন্য---"ভাঁড় বাঁধা নয়, মুখ দিয়ে টান।"[৩৬] অর্থাৎ পান-ক্রিয়াকালে মৈথুন নিষিদ্ধ এবং নারীর 'জনন-যন্ত্রে' সাধকের 'মুখ-যন্ত্র' আরোপ করে 'রস-শোষণ' করা কর্তব্য। হাউড়ে বহু বার পান-ক্রিয়ানুষ্ঠানের উপায় স্বরূপ মুখ-গহ্বর ব্যবহারের কথা বলেছেন। যথা----

১. প্রেম সুখ-দ্বার কৃষ্ণ-রসাকার,
　　রসনাতে তার কর আস্বাদন।[৩৭]...

২. লাল, জরদ, সবুজ, আর সাদা,
　রকম রকম দেখবি সে রঙ বলি সর্বদা।
　ঐ যে চাঁদের সুধা পদ্মের মধু সাধনে সাধু খাবে।[৩৮]

এ সম্প্রদায়ের অভিমত অনুযায়ী জননেন্দ্রিয় দ্বারা নারীর রজঃরক্ত থেকে রজঃ-রস পৃথকীকরণ রূপ 'ভিয়ানে'র প্রয়োজন নয়, বরং নারীর 'রস-নদী'তে আবির্ভূত প্রথম জোয়ারের জলপান আবশ্যক এবং অনুরূপ-ভাবে সাধকের জননাঙ্গ থেকে সাধিকা-কেও মুখ-মেহন দ্বারা 'বস্তু' গ্রহণ করাই হয়তো বিধি।

বাউল-সাধনার এ পদ্ধতি শাক্ত-মতানুসারী। হাউড়ে গোসাই প্রথম জীবনে তান্ত্রিক ছিলেন বলেই হয়তো তাঁর অনুসৃত সাধন-পদ্ধতিতে বিকৃত তন্ত্রাচার লক্ষণীয়। এটি বাউল-সাধনার মূল-রীতির বিরোধী। তাই হারাধন দাস লিখেছেন----

লিঙ্গনাল বিনা অন্য রূপেতে গ্রহণ।
করিলে না হবে সিদ্ধি নরকে গমন॥
যদি বল হেন কার্য্য কখন কি হয়।
যোগের প্রভাবে হবে নাহিক সংশয়॥[৩৯]

কাজেম-সম্প্রদায়ের করণ

বাউল ফকীর কাজেম আলী বিশ্বাস-এর রচনায় তিন দিনের ক্রিয়ার যে আভাস দেওয়া হয়েছে—তাতে রজঃকালীন তিন দিন-ই মিলন বিহিত। এ তিন দিনের করণীয় সম্পর্কে কাজেম বলেছেন----

প্রণয় সাগু অতি লঘু
পান করিবি প্রথম দিনে।...
পরদিন আনন্দ চালে
শ্রদ্ধাডালে
পাক করিবি যোগ আগুনে।...
শান্তি-জলে প্রেম-হিল্লোলে
স্নান করবি পর তিন দিনে।[৪০]...

অর্থাৎ কবির মতে প্রথম দিন 'পান-ক্রিয়া', দ্বিতীয় দিন 'পাক-ক্রিয়া' ও তৃতীয় দিন 'শান্ত মিলন ক্রিয়া' আবশ্যক। এ তিন দিনের তিন পর্যায়কে কবি যথাক্রমে "তারুণ্যামৃত কারুণ্যামৃত ও লাবণ্যামৃত" ধারায় স্নান বলেছেন।

কাজেম শাহ্ পানের বিশেষ পদ্ধতি সম্পর্কে কোন স্পষ্ট উক্তি করেছেন কি না বলা যায় না। তবে নিম্নোক্ত স্তবক থেকে মনে হয় রজঃবীর্য মিশ্রিত বস্তু থেকে ভিয়ান দ্বারা পৃথকীকৃত রস-পান করাই ছিল তাঁর মূল সাধনা। এটা হয়তো তিনি প্রথম দিনেই করতেন। তিনি একটি গানে বলেছেন—

আছে যার স্বরূপ সাধা
সে না মানে বাধা
রসজ্ঞ যে পান করে সে
বিষ ছেড়ে সুধা।
যেমন হংস-চক্রবাক ছেড়ে উদক
দুগ্ধ-মৃণাল খায় সদায়।[৪১]

এ ক্ষেত্রে পান-ক্রিয়া লিঙ্গ-নালে ঘটাই সম্ভব। আর সে জন্যেই হয়তো কবির বক্তব্য——

বস্তু অনায়াসে উঠে প্রবর্ত সাধিতে
পড়ে বিষম সঙ্কটে সাধক
বস্তু নামাইতে॥[৪২]

আলোচ্যাংশে রসের ভিয়ানগত দুরূহতার কথাই বলা হয়েছে। কাজেম শাহের মতে প্রথম দিনেই শুভ যোগের উদয় হয় এবং সেই দিন-ই 'মীন-'ধরা আবশ্যক।

অন্যান্য সম্প্রদায়ের করণ-বৈচিত্র্য

তিন দিনের ক্রিয়া ও রস-পান সম্পর্কে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে পদ্ধতি-গত বিভিন্নতা থাকায় কোন কোন গোষ্ঠীর সাধক-সাধিকা লিঙ্গ-নাল দ্বারা শোষণ-কার্যে অক্ষম হওয়ায় স্ত্রী-অঙ্গে রজঃবীজের মিলন ঘটিয়ে পাত্রে ধারণ করে তা' পান করেন।

কোন কোন সম্প্রদায় নিষ্কাশিত রজঃবীর্য---চাউলের গুড়া, মধু, গুড়, চিনি প্রভৃতি একত্রে মিশিয়ে পিষ্টক তৈরি করে ভক্ষণ করে। তারা একে 'প্রেম-ভাজা' বলে।

এছাড়া সাধক-ভেদেও আলোচ্য করণের নানা বিভিন্নতা বিদ্যমান।

উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বাউল-সাধনার এ প্রধান অংশের (তিন দিনের ক্রিয়ার) সম্প্রদায়গত ভেদের কোন উল্লেখ করেননি।

চতুর্থ (?) ও অন্যান্য দিনের ক্রিয়া

উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ফকীর পাঞ্জ শাহের পূর্বোক্ত "ত্রিবেণীর তীর-ধারে সুধারে জোয়ার আসে" গানটির ভুল ব্যাখ্যাও[৪৩] বাউলদের 'সাড়ে তিন রতির সাধনার আনুক্রমিক সংখ্যা মেলাতে গিয়ে 'চতুর্থ দিনের ক্রিয়ার'ও উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন——"তিন দিনের পরবর্তী ক্রিয়া মিলনের দিক হইতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই তিন দিনের শেষে 'সহজ মানুষ' বা 'অধর মানুষ' আবির্ভূত হন বলিয়া বাউলগণ কল্পনা করিয়াছে।

এই মিলনের সময়টি হইতেছে সেই সময়, যখন ভাঁটার টানে প্রবাহ শুকাইয়া গিয়াছে, কিন্তু অতি ক্ষীণ অস্তিত্ব একটু আছে। এই সময়টি প্রথম চব্বিশ ঘন্টা, দ্বিতীয় চব্বিশ ঘন্টা, তৃতীয় চব্বিশ ঘন্টার পর, চতুর্থ চব্বিশ ঘন্টার সূত্রপাতের অব্যবহিত পরেই উপস্থিত হয়। উহা অনেক ক্ষেত্রে ব্যবহারিক দিক হইতে চতুর্থ দিনে পড়িয়া যায়। তিন দিনের ক্রিয়ায় কাম অংশ নষ্ট হইয়া এই সময় প্রেমের আবির্ভাব হয়----ইহাই বাউলদের ধারণা। তাহারা এই তিন দিনে তিন রতি ও তাহার অব্যবহিত পরবর্তী সময়কে 'আধ রতি' বলিয়া নির্দেশ করিয়াছে। অনেক বাউল তাহাদের সাধনাকে 'সাড়ে তিন রতির সাধনা' বলিয়া নির্দেশ করিয়াছে।"[৪৪] ড. ভট্টাচার্যের এ বক্তব্য যথার্থ নয়। কারণ 'আধ রতি' অর্থ, চতুর্থ দিনের রজঃস্রাবের প্রারম্ভিক সময়ের ক্ষীণ ধারা নয়। বাউল মতে স্ত্রী-পুরুষে অবস্থিত 'রতি' 'রূপ' 'বস্তু' আদিতে এক ও অভিন্ন ছিল। লীলারস আস্বাদনের জন্য সেই একের দ্বিভাগে, আত্মপ্রকাশ---পুরুষ ও নারীতে। তাই নারীর 'রতি' পূর্ণ নয়---অর্ধ্ব। এখানে রতি অর্থ কাম: 'ডাক' বা সন্তান-জনন সম্ভাবনার পরিচায়ক যৌনাঙ্গে নিঃসৃত শ্বেতবর্ণ পদার্থ বিশেষ। আবার 'কাম-রস' এবং ডিম্বানুবাহিত রজঃরস-কেও 'আধ রতি' বলে।[৪৫] বাউলদের মধ্যে যাঁরা দ্বিতীয় অর্থে আধরতির সাধনা করেন, তাঁরা 'প্রথম দিনের প্রথম বিন্দু' পান করেন। আর যারা প্রথমার্থে 'অর্ধ-'রতি'র সাধনা করেন---তাঁরা উত্তর-সাধিকার স্বাস্থ্য, দৈহিক স্রাব-প্রবণতা ও মানসিক অবস্থা-ভেদে ভাঁটার টানের তারতম্য অনুসারে চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ বা সপ্তম দিনে 'পান' করতে অভ্যস্ত। এ কাজ নির্ভর করে---প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ প্রভৃতি দিনের আনুক্রমিক সংখ্যার উপর নয়, বরং পূর্বোক্ত 'ডাক আসা-না-আসার উপর। এক্ষেত্রে 'ডাকে'র চিহ্ন-দর্শনই শুভ যোগের উদয়। আলোচ্য সময়েই বাউলদের সুবিখ্যাত 'মনের মানুষ', 'রসের মানুষ' বা 'অধর মানুষে'র আবির্ভাব।

মিলন-বিধি

যা হোক, 'পান' ও 'মিলন ক্রিয়া' সম্প্রদায় নির্বিশেষে যেদিন যে ভাবেই করা হোক না কেন, মিলনের কতিপয় আনুষ্ঠানিক রীতি আছে যা বাউলগণ মোটামুটিভাবে পালন করে থাকেন।

প্রথমতঃ সম্প্রদায় ভেদে রজস্বলা উত্তর-সাধিকাকে নানা উপাচার দ্বারা তুষ্ট করে তার যৌনাঙ্গকে 'পূজা' করা হয়। একে ঘাট পূজা বলে। সকল সম্প্রদায়ই ঘাট পূজা করে না। এ পূজায় এক এক দিন একটি মন্ত্র ব্যবহৃত হয়।[৪৬]

দ্বিতীয়ঃ সময় নিরূপণ। পান ক্রিয়ার সময় নিরূপণের মত মিলন-ক্রিয়ারও সময় নিরূপণ করা প্রয়োজন। আমাকে লালনপন্থী জনৈক বাউল বলেছেন----'রাত্রের আহারান্তে শয্যাগ্রহণের পর গভীর রাত্রে যখন চিত্ত স্থৈর্য লাভ করে, চাঞ্চল্য থাকে না এবং সাধক-সাধিকার একই সময়ে বাম নাসিকায় শ্বাস প্রবাহিত হয়, তখন-ই সে সময় আসে। উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বলেছেন----"অর্ধ-প্রহর বা দেড় ঘন্টা-কাল স্থায়ী এ সময়টি আসে রাত্রে আহারের দুই ঘন্টা পরে।"[৪৭] এরূপে সাধক সাধিকার যোগ-মিলনকাল নিরূপিত হয়।

তারপর আরোপ: 'আলাপন', 'শৃঙ্গার' এবং 'প্রবেশ-ক্রিয়া'।

বাম-নাসিকায় শ্বাস প্রবাহকালে সাধক একটি বিশেষ আসনে নায়িকার ভ্রূমধ্যস্থ দ্বিদল পদ্মে স্থির দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখেন। গুরুর যুগলমূর্তির ধ্যানসহ পরস্পরের এরূপ অচঞ্চল দৃষ্টি ও অবস্থাকে 'আরোপ' বলে।

কিছুক্ষণ এ-অবস্থায় রেচক-পূরক-কুম্ভক অভ্যাসের পর সাধক 'নেহার' ত্যাগ করেন এবং 'আলাপন' ও 'শৃঙ্গারে' রত হন।

'শৃঙ্গার' কালে নায়ক, নায়িকার বাম চক্ষে দৃষ্টিপাত দ্বারা কামোত্তেজনা বৃদ্ধির প্রয়াস পান। একে 'মদন' বলে। তারপর প্রবেশ 'ক্রিয়া'। 'এ-ক্রিয়া—আয়ুর্বেদের তৈলপাকের ন্যায় মদু-মধ্য-খর-ক্রমাৎ" বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন এবং 'মাদন' 'প্রেম-হিল্লোল' বা 'বিলাস' নামে অভিহিত। মৈথুন সময় স্বীয় বীজ বিচলনের উপক্রম হলে সাধককে স্থির অবস্থায় বিশেষ আসন ও মুদ্রা অবলম্বনসহ 'কুম্ভক' করা প্রয়োজন। একে 'স্তম্ভন', বলে। সাধারণতঃ 'মূলবন্ধ', ও 'অশ্বিনী মুদ্রা' সহযোগে কার্যটি সম্পন্ন হয়।[৪৮] এ সম্পর্কে বাউল গানে বিশেষ বিধি—নির্দেশ দেখা যায় না।

তবে কুবীর গোসাঁইর নিম্নোক্ত কবিতাংশে 'মূলবন্ধে'র ইঙ্গিত রয়েছে বলে মনে হয়। তিনি বলেছেন---

যেসব দুগ্ধে বারি পাঁরিত ভারি
জালে নিষ্ঠা বল;
পরে তাই দিয়ে দম্বল।
মথনে হয় সেই দধির ঘোল
ঘোলেতে মাল মালেতে ঘোল
কুবীর বলে তায় ছেঁকে তোল
চরণ দণ্ডি চেপে॥[৪৯]

এখানে যে 'মূলবন্ধের'ই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তা' কবির শেষোক্ত উক্তির সঙ্গে 'শিব-সংহিতা'র চতুর্থ পটলোক্ত ৬৪-৬৫ সংখ্যক শ্লোক এবং হঠযোগ-প্রদীপিকার তৃতীয়াপদেশোক্ত ১৮-সংখ্যক শ্লোকে বিধৃত 'মূলবন্ধে'র গুরুত্ব, পরিচয় ও মাহাত্ম্যকীর্তনের তুলনা করলে বোঝা যায়।[৫০]

যাহোক, এরূপ যোগ-পাক অন্তে লিঙ্গ-নালে 'রস' শোষণের কার্য 'শোষণ' নামে পরিচিত। 'রজোলা মুদ্রা' দ্বারা শোষণ কার্য সমাধা হয়। তারপর শান্ত নিষ্ক্রিয় অবস্থা 'মোহন' বা সমাধি। 'বাউল' সাধনায় 'পঞ্চবাণে'র ক্রিয়া এ-ই।

সাধনকর্মে পূর্বোক্ত আচার অনুষ্ঠান সকলেই জানেন ও পালন করেন তা' নয়। ক্রিয়াসমূহের নানা রূপভেদ ও বিদ্যমান।[৫১]

বাৎসরিক নানা পর্বানুষ্ঠান

উপর্যুক্ত নানা সাধন-ভজন ব্যতীত বাউল সম্প্রদায়ে বাৎসরিক বিভিন্ন পর্বও পালিত হয়। এগুলোর মধ্যে বার্ষিক অধিবাস, বাউল মহোৎসব, রাস-মিলন, ঝুলন, বৈশাখী পূর্ণিমা, আষাঢ়ী পূর্ণিমা ও চৈত্র পূর্ণিমা উদ্‌যাপন ষাট ভক্ষণ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। উক্ত বিষয়সমূহ সম্পর্কে উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য কোন আলোচনা করেননি।

বার্ষিক অধিবাস

'বার্ষিক অধিবাস' বাউলদের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় কর্তব্য। সাধারণতঃ প্রতি বছর-চৈত্র পূর্ণিমায় এ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। কোন কোন বাউল-সম্প্রদায় কর্তৃক ফাল্গুন-মাসেও এ উৎসবের আয়োজন করা হয়। তিন দিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে স্ব-গণ-এর সকল সাধক-সাধিকা একত্রিত হয়ে মিলিত ভাবে নাচ-গান, জিকির ও চক্র-মিলনের (গোপী চক্র নয়) ব্যবস্থা করে। কোন কোন বাউল সম্প্রদায়ে এই দিন নতুন লোকদের দীক্ষাদান করা হয়।

বাউল মহোৎসব

আত্ম-কল্যাণ ও পারিবারিক কল্যাণ কিংবা মৃতের কল্যাণের জন্য কখনও কখনও সঙ্গতি-সম্পন্ন বাউল কর্তৃক বিপুল সংখ্যক বাউল নরনারীকে ভোজনোৎসবে যে আপ্যায়ন করা হয়----তাকেই 'বাউল মহোৎসব' বলে। সাধারণতঃ যে কোন রকম কল্যাণ-কামনায় বৎসরের যে কোন দিন এক বা একাধিক বার এ অনুষ্ঠান পালন করা চলে। বাউল মহোৎসবে পান-ভোজনাদির পর মিলিতভাবে জিকির, সঙ্গীত কিংবা নাম-কীর্তন অনুষ্ঠিত হয়।

ষাট্ ভক্ষণ

বাউল-সম্প্রদায় কর্তৃক অনুষ্ঠিত 'বার্ষিক অধিবাস', 'বাউল মহোৎসব' প্রভৃতিতে সমাগত বাউল নরনারীকে ভোজন করানো হয়। অন্ন ও বহুপ্রকার ব্যঞ্জন---যেমন আলু, পটল, ঝিঙে, উচ্ছে, লাউ, বেগুন, পেঁপে প্রভৃতি একত্রে রান্না করে সমাগত সকল ভক্তদের একত্রে পরিবেশন করা হয়। একে 'ষাট্-ভক্ষণ' বলে। কোন কালে হয়তো এরূপ ভোজনোৎসবে ষাটপ্রকার ব্যঞ্জন একসঙ্গে রান্না করে পরিবেশন করা হত বলেই এ অনুষ্ঠানটি 'ষাট-ভক্ষণ' নামে অভিহিত।

আবার একে 'সাদ ভক্ষণ' বা 'সাধ-ভক্ষণ'ও বলে। সেক্ষেত্রে হয়তো সাধুদের আহার্যগ্রহণ অর্থেই 'সাধ-ভক্ষণ' কথাটি এসে থাকবে।

আলোচ্য ভোজনোৎসবের বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই যে, অভ্যাগত ভক্ত-নারীদের মধ্য থেকে একজন সুন্দরী তরুণী বা যুবতী একটি বিরাট

পাত্রে প্রস্তুত অন্ন-ব্যঞ্জনাদি একত্রে মাখিয়ে তা' থেকে স্বহস্তে একটু একটু করে তুলে সকল পুরুষের মুখে উঠিয়ে দেন। সাধারণভাবে সকলে আহারান্তেই এরূপ একটি অনুষ্ঠান কোন কোন সম্প্রদায় কর্তৃক কখনও কখনও অনুষ্ঠিত হয়। একে 'সাধু সেবা'ও বলে। সম্ভবত এ অনুষ্ঠান পালনের উদ্দেশ্য উচ্ছিষ্ট-বিচার, জাতি-বিচার, হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িকতা প্রভৃতির বিলোপ। এটি হয়তো তাদের সম্প্রদায়গত নিরঙ্কুশ সমতার উদাহরণ। প্রায় এক-ই ভাবে গুরুর মৃত্যু-দিবস, বৈশাখী পূর্ণিমা, আষাঢ়ী পূর্ণিমা, রাস, দোল, ঝুলন প্রভৃতি উৎসবও বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায় কর্তৃক পালিত হয়।

সাধক স্তরের এসব করণ সকল বাউল-সম্প্রদায়েই অল্পাধিক পালিত হতে দেখা যায়।

সিদ্ধস্তরের সাধনা

সিদ্ধ-স্তরে সাধক, ধর্ম-পালনে বাহ্যাড়ম্বর ত্যাগ করেন। তখন আর অতিশয় সাবধানতা, কঠিন পরিশ্রম ও কঠোর সংযমের আবশ্যকতা। থাকে না। এ সব তখন স্বভাবানুগ হয়ে ওঠে। সে সময় স্বাভাবিক ভাবেই সাধক বিভিন্ন আসন, মুদ্রা, রেচক, পূরক, কুম্ভক ইত্যাদি ক্রিয়ায় অভ্যস্ত হয়ে পড়েন এবং মল, মূত্র, শুক্রসহ দেহ-মনের ওপর নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা লাভ করেন। এস্তরে কোন অবস্থাতেই তার শুক্র-বিচলন ঘটে না বলে "শত অঙ্গনার সঙ্গে বিলাস" করলেও বিন্দুপাত হয় না। এ রকম সিদ্ধ ব্যক্তি জননেন্দ্রিয় দ্বারা দুগ্ধ বা জল পান, ঘন্টার পর ঘন্টা পতনবিহীন মৈথুনে অবস্থান প্রভৃতি কর্মে সমর্থ হন।

আলোচ্য পর্যায়ে সাধক কেবল আত্মদৈন্য ও প্রার্থনামূলক সঙ্গীতে সাধন-ভজন রত থাকেন। তখন 'মনের মানুষে'র নিকট তাঁর আর আত্মহারা ভাব নয়, আত্মহারার পর আত্ম-জাগরণের অবস্থা। সূফী পরিভাষায় একেই "বাকা বিল্লাহ্" (to live in him) বলে।[৫২]

লালন শাহী সম্প্রদায় ব্যতীত অন্যান্য বাউল সম্প্রদায়ের সাধন-ভজনের বিবিধ রীতির মোটামুটি পরিচয় এ-ই। লালন-সম্প্রদায়ের সাধনার বিবরণ বারান্তরে আলোচনা করা হবে।

তথ্যনির্দেশ

১ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, বাংলার বাউল ও বাউল গান, (দীপান্বিতা, কলি,—১৩৬৪), পৃষ্ঠা ৩৭০ চতুর্থ অধ্যায়, 'বাউল ধর্মের সাধনা'।

২ See Maulavi Abdul Wali. On Curious Tenets and Practices of certain class of Faqirs of Bengal of IASB',' P. 211.

৩ দ্রষ্টব্য, উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত পৃ. ৩৮৭-৪৩৭। চতুর্থ অধ্যায়, "বাউল ধর্মের সাধনা"।

৪ দ্রষ্টব্য, শাহ লতীফ আফী আনহু, বাউল দর্শন ও বাউলগানের সংজ্ঞা নিরূপণ, সমকাল (শ্রাবণ ১৩৬৭) পৃ. ৯১৬

৫ পুরুষের তিন প্রস্থ পোষাক যথাক্রমে----পিরহান, ইজারা ও লেফাফা এবং নারীর পাঁচ প্রস্থ পোষাক হ'ল----পিরহান, ইজার, লেফাফা, শিরবন্দ ও সিনাবন্দ। এ-ই মুসলিম---বিশেষতঃ লালনপন্থী বাউলদের প্রকৃত পরিচ্ছেদ।

৬ খুলনা জেলার বাগেরহাট মহকুমার রামপাল থানার আবদুল গফুর নামক একজন লালন-পন্থী বাউলের সঙ্গে ১৯৭০ সালের ২রা জুলাই আমার বাসায় যে আলাপ হয়, সেই আলোচনার ডায়েরীতে ধৃত অংশ অনুযায়ী লিখিত।

৭ দ্রষ্টব্য, উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২৬-২৭। ৪র্থ অধ্যায়, ঐ

৮ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৯৭। ৪র্থ অধ্যায়, ঐ

৯ এ. এইচ. এম. ইমাম উদ্দীন, বাউল মতবাদ ও ইসলাম (কুষ্টিয়ায়, ১৯৬১), পৃ. ২৪। "বাউল সাধনার পদ্ধতি।"

১০ Maulavi Abdul Wali, Ibid, P. 211

১১ Ibid

১২ মৌলবী রেয়াজ উদ্দীন, বাউল ধ্বংস ফতোয়া, পৃ. ৪৬

১৩ মৌলানা আকরম খান, মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস, ১২০। ১৯ শ অধ্যায়। 'প্রাসঙ্গিক আলোচনা'।

১৪ এ সম্পর্কে স্বতন্ত্র প্রবন্ধে আলোচনা করা হবে।

১৫ See, John A. Sobhan, Sufisn : Its saints and shrines, PP. 1-4 Chap. I.

১৬ মওলানা আকরম খান, পূর্বোক্ত, ১৯শ অধ্যায়, "প্রাসঙ্গিক আলোচনা," পৃ. ১১৯

১৭ অক্ষয়কুমার দত্ত, উদ্ধৃত, উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত, ৪র্থ অধ্যায়, "বাউলধর্মের সাধনা," পৃ. ৪২৮

১৮ দয়ানন্দ সরস্বতী, সত্যার্থ প্রকাশ (নামপত্র ছিন্ন), একাদশ সমুল্লাস (উত্তরার্দ্ধঃ), পৃ. ৩৩৯

১৯ দয়ানন্দ সরস্বতী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩৯, ঐ

২০ উদ্ধৃত, আবুল হাসানাৎ, যৌন-বিজ্ঞান, ১ম খণ্ড (মহিউদ্দীন আহ্‌মদ প্রকাশিত একাদশ সংস্করণ, ঢাকা, ১৯৭৩), "ধর্ম ও প্রথাগত যৌন কদাচার," পৃ. ৪৯০-৯৬

২১ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২৯। ৪র্থ অধ্যায়, "চারিচন্দ্র ভেদ"।

২২ এ. এইচ. এম. ইমাম উদ্দীন, পূর্বোক্ত, "বাউল সাধনার পদ্ধতি ও ইসলামী শরীয়ত," পৃ. ৩৮

২৩ হরাধন দাস বৈষ্ণব, আশ্রয় সিদ্ধান্ত চন্দ্রোদয়, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৭-২৮

২৪ মতান্তরে----কুব্জা, রুক্মিণী, ও রাধা।

২৫ মতান্তরে----সংস্করা, সহজ ও অযোনি।

২৬ মতান্তরে----গরল, শম্ভু, অমৃত।

২৭ মতান্তরে----সাধারণী, সমঞ্জসা, সামর্থা।

২৮ মতান্তরে----পদ্মা, যমুনা, ভাগিরথী।

২৯ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত, ৪র্থ অধ্যায়, "বাউল ধর্মের সাধনা," পৃ. ৩৯৮-৯৯

৩০ পাঞ্জ খোন্দকার, ছহি ইস্কি ছাদেকী গওহোর (লেখক কর্তৃক প্রকাশিত, দ্বি-সং, কলি----১৩১৪(?), "নূরনীয় ভিয়ানের বয়ান পৃ. ৪০।

৩১ দ্রষ্টব্য, খোন্দকার রফিউদ্দীন, ভাব-সঙ্গীত (মোঃ কানাই তালুকদার প্রকাশিত, ১ম সং, কুষ্টিয়া—১৩৬৪) পৃ. ৫১-৫৩ খোন্দকার পাঞ্জ শাহের পদাবলী, গানসংখ্যা, ১২০-২৪

৩২ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত, ৪র্থ অধ্যায়। "বাউল ধর্মের সাধনা," পৃ. ৪০১

৩৩ খোন্দকার রফিউদ্দীন, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৩। খো, পা, শা, প, সং, ১২৩

৩৪ পাঞ্জ খোন্দকার, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪০, "নূরনীর ভিয়ানের বয়ান"।

৩৫ দ্রষ্টব্য, উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৬৬। হাউড়ে গোসাই, গান সংখ্যা" ৩২৬

৩৬ নিজস্ব সংগৃহীত গান। প্রথম পংক্তি---"প্রেম রসের গাছে রস আছে জানে রসিক জনা।"

৩৭ দ্রষ্টব্য উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৬৪। হা. গো. গা; সং, ৩২৪।

৩৮ দ্রষ্টব্য, উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৬৭। হা.গো. গা.সং৩২৭

৩৯ হারাধন দাস বৈষ্ণব, আশ্রয় সিদ্ধান্ত চন্দ্রোদয়, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৩৮

৪০ নিজস্ব সংগ্রহ থেকে উদ্ধৃত। প্রথম পংক্তি--"চেয়ে দ্যাখ না রাই দু'নয়নে।"

৪১ নিজস্ব সংগ্রহ থেকে উদ্ধৃত। প্রথম পংক্তি"হয়ে রসিক, রসে মগন।"

৪২ নিজস্ব সংগৃহীত। গানটির ধ্রুব পদ উদ্ধৃত হয়েছে।

৪৩ এই আলোচনার পূর্বোক্ত "পাঞ্জ সম্প্রদায়ের করণ" অংশসহ দ্রষ্টব্য, উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত পৃ. ৪০১। ৪র্থ অধ্যায় "বাউল-ধর্মের সাধনা"।

৪৪ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত পৃ, ৪১৪-১৫। ৪র্থ অধ্যায়। ঐ।

৪৫ বৈজ্ঞানিক বিচারে বলা যায়, এ হোল নারীর স্যন্দনী গ্রন্থি (Bartholinis Gland) ও ডিম্বাশয় (Overy) বা Gonads থেকে ক্ষরিত রস। এ রসের মধ্যে মানব শরীরের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় 'ফলিকুলার হরমোহন 'প্রোজেস্টিন হরমোন' ও 'ইস্ট্রিন হরমোন বিদ্যমান।ক এ-গ্রন্থিরস নারীর সৌন্দর্য ও লাবণ্য বিশেষতঃ মসৃণ ত্বক, কোমল অঙ্গ, মিষ্ট কণ্ঠ, দেহের কমনীয় রেখা এবং যৌবনের প্রফুল্লতা দান করে। আর এর কিছু ওলটপালট ঘটলে মানুষের স্বভাবেরও পরিবর্তন হয়। এ হরমোন নিঃশেষিত হলে স্ত্রী-পুরুষ সবাই সমান হয়ে যায়। বৃদ্ধকালে এসব হরমোন আপনিই নিঃশেষিত হয়।গ সে জন্য জরা, ব্যাধি, মৃত্যু থেকে মুমুক্ষু বাউলরা প্রচুর হরমোন

বিশিষ্ট নারীর উক্ত রস পান করে স্বাস্থ্য, কান্তি ও শক্তি লাভ করেন। বাউলদের অপেক্ষাকৃত সুস্থ, সবল ও দীর্ঘ জীবন লাভের রহস্য সম্ভবতঃ এখানেই।

ক দ্রষ্টব্য, মোঃ নূরুল ইসলাম, যৌবনের ঢেউ (ওসমানিয়া বুক ডিপো-প্রকাশিত, বর্ধিত ৮ম মুদ্রণ, ১৩৭৩) পৃ. ৫০-৫৫

খ দ্রষ্টব্য, অমর জ্যোতি সেন, গ্রন্থি-তত্ত্ব, দেশ--(৫ই শ্রাবণ-১৩৫২) পৃ. ৪৫২

গ পশুপতি ভট্টাচার্য ডি. টি. এস., হর্মোন ক্রিয়া, দেশ (৮ই বৈশাখ ১৩৬২), পৃ. ৪৫৩

৪৬ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১৪। ৪র্থ অধ্যায় ঐ

৪৭ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১৫। ৪র্থ অধ্যায়, ঐ

৪৮ দ্রষ্টব্য, উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১৫-১৬। ৪র্থ অধ্যায়। ঐ

৪৯ নিজস্ব সংগ্রহ থেকে উদ্ধৃত। প্রথম পংক্তি—"কালো মানিক ঢাকা আছে।"

৫০ দ্রষ্টব্য, উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত, পৃ.৪১৫-১৬। ৪র্থ অধ্যায় ঐ

৫১ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২২। শেষ অনুচ্ছেদ। ৪র্থ অধ্যায় ঐ

৫২ See, A. G. Arberry, Sufism--An Account of the Mystics of Islam (George Allen & Unwin Ltd., London; 2nd Imp.—1956); P. 58